'উস্তাদ আলি হাম্মুদা'র লেকচার অবলম্বনে

কলবুন সালীম

নির্মল অন্তর, নির্মল জীবন

মহিউদ্দিন রূপম

সমর্পণ

উস্তাদ আলি হাম্মুদা ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত একজন আলিম। বেড়ে উঠেছেন যুক্তরাজ্যে। পেশায় একজন আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার। ব্যাচেলর এবং মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেছেন যুক্তরাজ্যের University of the West of England থেকে। এরপর পাড়ি জমান মিশরের আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবং অর্জন করেন শারীআর ওপর ব্যাচেলর ডিগ্রি। বর্তমানে কার্ডিফের Al-Manar ইন্সটিটিউটে বিভিন্ন প্রোগ্রামের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। পাশাপাশি লন্ডনের Muslim Research & Development Foundation এর একজন সিনিয়র গবেষক এবং লেকচারার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। একজন বক্তা হিসেবেও তিনি বেশ জনপ্রিয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দাওয়াতি কাজ আঞ্জাম দিয়ে চলছেন। ইতঃপূর্বে সমর্পণ প্রকাশন থেকে তার 'The Daily Revivals' সিরিজ অবলম্বনে রচিত 'হারিয়ে যাওয়া মুক্তো' বইটি পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। একই প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'বিপদ যখন নিয়ামাত' বইতেও তার কিছু লেখা স্থান পেয়েছে।

কলবুন সালীম

নির্মল অন্তর, নির্মল জীবন

মহিউদ্দিন রূপম

সূচিপত্র

প্রারম্ভিক কথা ---------------------------- ৬

সাফল্যের এপিঠ-ওপিঠ --------------- ১০

সংশয়মুক্ত ঈমান ---------------------- ২১

শুদ্ধ জীবন শুদ্ধ মনন ----------------- ৩৭

ক্যালেন্ডারের পাতায় ২১১৯ সাল --- ৪১

রহমানের পরিচয় ---------------------- ৪৩

ইবাদুর রহমান যারা ------------------ ৫৫

নির্মল অন্তর ---------------------------- ৬৪

যে পথ জান্নাতে গিয়ে মিশেছে -------- ৬৬

হারাম দরজা -------------------------- ৭৮

টুকরির বিনিময় প্রাসাদ --------------- ৮০

কুরআনের সাথে পথচলা ------------- ৮২

আল্লাহর সাথে কথা বলতে ----------- ৯৭

আমলের স্বাদ হারিয়ে গেলে -------- ১০০

দুআ : মুমিনের প্রাণ ----------------- ১০২

সব রোগের কার্যকরী ঔষধ ---------- ১১৩

একটি দুআর গল্প --------------------- ১১৬

মুমিনের সামাজিকতা ----------------- ১২৪

আমি সবাইকে মাফ করে দিয়েছি -- ১৩৭

খুশু : সবচেয়ে কঠিন যে ইবাদাত -- ১৪৯

নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ------ ১৬০

নিশিরাতে আল্লাহর সাথে ----------- ১৬৩

মুমিনের জীবনে অবসর ------------ ১৭৫

মৃত্যুর দোরগোড়ায় ----------------- ১৮৪

প্রকৃত স্বস্তি তাঁরই সান্নিধ্যে --------- ১৮৮

প্রারম্ভিক কথা

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وداعيا

সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে বর্তমান সুস্থতা নিয়ে মানুষের ধোঁকা খাওয়া। সে আশা করে আগামীতেও বুঝি এভাবে সুস্থ সবল থাকবে। আর এই আশায় শেষ বলে কিছু নেই, নেই কোনো সীমা পরিসীমা। প্রভাতে কিংবা সন্ধ্যা গড়াতেই ব্যক্তি এই আশা পোষণ করে। এভাবে প্রতারণার সময় যেতে থাকে, আশার ফিরিস্তিও হয় দীর্ঘ।

শিক্ষা হিসেবে তো এতটুকুই যথেষ্ট ছিল, আপনি আপনার সমবয়সী অনেককেই চলে যেতে দেখেছেন না-ফেরার দেশে। আপনার ভাই, আত্মীয়, প্রিয় ব্যক্তিদের অনেকের কবরই আজ পুরোনো হয়ে গেছে। হায়, তবুও কি আপনার চিন্তা জাগে না, আজ বাদে কাল আপনিও তাদের শিবিরে নাম লেখাতে যাচ্ছেন? এতকিছু সত্ত্বেও কি আপনার বোধ জাগে না কেউ সতর্ক করে দিলে?

বড়োই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক এটি। যার জ্ঞান আছে, যার বুদ্ধি আছে, সে কী করে এমন অবহেলায় জীবন নষ্ট করতে পারে?

লিখছিলাম ইমাম ইবনুল জাওযি ﷺ-এর দরদ-মাখা কিছু নাসীহা। উম্মতের প্রতি দরদী এই পিতা কত বাস্তব কথাই-না বলেছেন তাঁর সাইদুল খাতির গ্রন্থে! তবে দেহের সুস্থতা যেভাবে মানুষকে ধোঁকায় ফেলে রাখে, তেমনি মনের ঈমানের হালতও ব্যক্তিকে ধোঁকায় ফেলে দেয়। ব্যক্তি ভাবতে থাকে, যে স্বচ্ছ ঈমান নিয়ে সে পৃথিবীতে জন্মেছে, সেই একই

ঈমান নিয়ে সে পরকালে পাড়ি জমাবে। তবে দেহের অসুস্থতার বিষয়টি দৃশ্যমান হওয়ায় তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য ব্যক্তি সচেতন হলেও মনের অসুস্থতার বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ অবচেতন।

আর তাই সংশয়ের এই যুগে অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে আমাদের ঈমানের পরিচর্যা বড্ড বেশি প্রয়োজন। পরিবর্তনশীল এই যুগে অন্তরের ওপর সদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখলে পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। অনেকে বলে, আত্মার পরিচর্যা নিয়ে বাজারে এত বই থাকতে কী দরকার একই বিষয়ে আবার লেখার? কিন্তু অন্তর বলে, আমি পরিবর্তনশীল। তাই তো আমার নাম কলব, যার কাজ সদা তাকাল্লুব করা। অর্থাৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলাই আমার বৈশিষ্ট্য। কাজেই আমার প্রতি ক্ষণিকের অসতর্কতা তোমার বিপদ বয়ে আনবে।

আসলে আমাদের অন্তর-জমিনে-থাকা এই ঈমান অনেকটা পাখির পালকের মতো। ধু-ধু মরুতে সে উড়ে চলেছে। কখনও মুমিনদের শিবিরে, কখনও পাপীদের শিবিরে। কখনও ঈমানের শীতল হওয়ায় সে উড়ে যায় রবের আসমানে, কখনও পাপের ঝাঁপটায় আছড়ে পড়ে জমিনে। সকল তারীফ আল্লাহর, যিনি পাপের দরুন তাৎক্ষণিক আমাদের নাম কাফেরদের তালিকায় তুলে দেন না। রহমতের ছায়া থেকে কোনো তাওবাকারীকেই তিনি বঞ্চিত করেন না। সেই সাথে দরুদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর। যিনি এসেছিলেন এই ধরণিতে মুমিনদের হৃদয়-কুটিরকে আলোকিত করতে। সংশয় আর অবিশ্বাসের মরিচা-ধরা হৃদয়-প্রাচীরকে ঈমানের ছাঁচে ঢেলে সাজাবার জন্যে।

উস্তাদ আলি হাম্মুদা হাফিযাহুল্লাহ-কে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। শিহাব ভাইয়ের অনূদিত 'হারিয়ে যাওয়া মুক্তো'র মাধ্যমে ইতিপূর্বে পাঠকদের নিকট পৌঁছে গেছেন তিনি। ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত এই আলিমের খ্যাতি জগৎজুড়ে। তবে লেখক হিসেবে যতটা না বিখ্যাত, তার চেয়ে বক্তা হিসেবে তিনি সুপরিচিত।

প্রত্যেক দাঈ ইলাল্লাহর একটি নির্দিষ্ট আঙিনা থাকে। যে আঙিনাকে তিনি উর্বর করেন, বীজ বপন করেন, যত্ন নেয় আর সেঁচের মাধ্যমে তাদের বড়ো করে করে তুলেন। আগাছা পরিষ্কার করা, পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা—সার্বিক কাজ করেন তিনি। পরিশ্রম আর ধৈর্যের সহবস্থানে দাঁড়িয়ে উম্মতকে একটি উৎকৃষ্ট ফলন উপহার দেন। তাই একজন দাঈ-মাত্রই একজন কৃষক। উস্তাদ আলি হাম্মুদার আঙিনা হলো যুবসমাজ। যুবাদের অন্তরই তার খামার। অন্তরের শুদ্ধি নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ-করে-চলা এই মানুষটির সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ২০১৮ সালে। কর্মসূত্রে এক ভাইয়ের মাধ্যমে তাঁর নাম জানতে পারি। সে থেকে অনলাইনে থাকা তার প্রাঞ্জল বক্তৃতাসমূহ শুনতে

শুনতে কখন যে সব শোনা হয়ে গেল, নিজেও টের পাইনি।

অধিকাংশ পশ্চিমা দাঈ-র একটি অপ্রকাশিত বাস্তবতা হচ্ছে, সেখানে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামকে উপস্থাপন করা। ইসলামের যে-সকল বিষয়গুলো সমাজে প্রশংসিত, সেগুলো উল্লেখ করা, আর যেগুলো প্রকাশ করলে রূঢ় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়, সেই হক কথাগুলো এড়িয়ে চলেন তারা। ক্ষেত্রবিশেষে মনস্তাত্ত্বিক এই যুদ্ধে অনেকে পরাজয় মেনে নেন। তখন মুসলিম লেবাসে, আলিমদের পোশাকেই এক নব্য-ইসলামের-প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তারা। সেখানে হয়তো আকীদার তত্ত্ব কথা থাকে, কিন্তু প্রায়োগিক আলোচনা থাকে না। সেখানে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার আহ্বান করা হবে, কিন্তু আল্লাহর জন্য ঘৃণার আকীদা কেউ শেখাবে না। তাই প্রাঞ্জল ভাষা আর আবেগঝরা বক্তৃতায় অনেকে মুগ্ধ হয়ে যান। দ্বীন নিয়ে হালকা পড়াশোনা থাকলেও যুক্তির মারপ্যাঁচে শ্রোতাদের অনেকে এই সত্যটা উপলব্ধি করতে পারে না। তারা ভুলে যান, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ, পরিবেশ, পরিস্থিতি দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। আকীদা বিশ্বাস নিয়ে অধিকাংশের বুঝ নড়বড়ে হওয়ায় বুঝতে পারেন না কোথায় ভুল হচ্ছে। এ জন্য আমাদের ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি ﷺ বলেছেন, 'প্রকৃত অবিচলতা হলো একত্ববাদের ওপর অন্তরের অবিচলতা।'

শুদ্ধির যাত্রা শুরু হবে তাওহীদের শিক্ষা দিয়েই, আল্লাহকে চেনার মধ্য দিয়ে। যে আল্লাহকে যথাযথ চেনে না, তাকে যিকর আর আমলের বাহার শুদ্ধ করতে পারবে না। সে মুসলিমদের লেবাস পড়বে, কিন্তু হারাম লেনদেনকে হালাল জ্ঞান করবে। মাসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়বে, কিন্তু জালিমদের জয়গান গাইবে। তাই তো আমাদের পূর্ববর্তীগণ পাপের কারণ হিসেবে বলতেন, 'লোকটি আল্লাহকে যথাযথ সম্মান করেনি, তাই সে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে।'

উস্তাদ আলি হাম্মুদার এ-যাবৎ যত লেকচার দেখেছি, তিনি ব্যতিক্রম। শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের চেয়ে তাদের শুদ্ধির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। বক্ষ্যমাণ বইটি উস্তাদ আলি হাম্মুদার লেকচার সংকলন। এ ছাড়া তাঁর ব্লগে, ফেইসবুকে উম্মতের উদ্দেশ্যে উপকারী যে উপদেশমালা ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমি সেগুলোও বাছাই করে নিয়ে এসেছি এখানে। অনুবাদ নয়, বরং ছায়া অবলম্বনে রচনা করেছি 'কলবুন সালীম : নির্মল অন্তর, নির্মল জীবন' গ্রন্থটি।

শ্রদ্ধেয় জুবায়ের ভাইয়ের সম্পাদনায় লেখাগুলো আরও পরিপূর্ণতা পেয়েছে আলহামদু লিল্লাহ। এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার মতো অধমের লেখা সংশোধন করে দিয়েছেন—এজন্য আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। সেই সাথে প্রকাশক, পাঠকদের ভিতর যারাই আমাকে

লেখার পেছনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, আল্লাহ যেন এর প্রতিদান তাদের আমলনামায় যুক্ত করে দেন।

পরিশেষে নিজেকে বলব, প্রত্যেকটি বইয়ের সাথে লেখকের দায়বদ্ধতা থাকে। এই দায়বদ্ধতা যতটা না পাঠকের সমীপে, তার চেয়ে লেখকের নিজের। এই দায়বদ্ধতা আমলের, এই দায়বদ্ধতা দাওয়াতের। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষর এই আবদার নিয়েই লেখকের কলমে জন্মায়। আল্লাহই এই তাওফীক দেন, যেন বান্দা এ দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি তালাশ করতে পারে। আর যে এই কলমের অপব্যবহার করে, তাকে তার কলমই ধ্বংস করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ বলেন, 'যে বান্দা যত বেশি রবের নিয়ামাতরাজিতে ডুবে থাকে, সে তত বেশি কৃতজ্ঞতা আদায় ও তাওবা ইস্তিগফারের মুখাপেক্ষী হয়।'

তাই এই বই প্রকাশ আমার জন্য যতটা সুখকর, তার চেয়ে শঙ্কার। হুজ্জাত কায়েম হয়ে গেছে, সময় এখন হক আদায়ের। আর এর হক তখনই আদায় হবে, যখন এর প্রতিটি পাতা আমার অভ্যাসে পরিণত হবে। তাই বইটি শুধু পাঠকদের জন্যই নয়, আমার জন্যও। এতে স্থান-পাওয়া প্রতিটি নসিহত সবার আগে আমি নিজেকে দেব। এরপর পাঠক এতে ভালো যা কিছু পাবে, তার জন্য আল্লাহরই শোকর। তিনি যাকে ইচ্ছা, তাকে রহমতের চাদরে ঢেকে দেন। লেখকের কলম এখানে মাধ্যম মাত্র।

আমি ভুলের ঊর্ধ্বে নই। আত্মশুদ্ধির বাইরেও নই। বইটি আপনাদের আগে আমার নিজের জন্যই লেখা। তাই আপনার যত ভালো লাগা, মন্দ লাগা, এই অধমের প্রতি যত নসিহত আছে জানাতে কার্পণ্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে। আল্লাহু মুসতাআন।

মহিউদ্দিন রূপম

mohiuddinrupom1415@gmail.com

০৫/৬/২০২০ ইং

সাফল্যের এপিঠ-ওপিঠ

বছর কয়েক আগের কথা। অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবস মারা গেলেন। এমন কেউই হয়তো নেই, যে কিনা জবসের মৃত্যুসংবাদ শোনেনি। প্রায় একই সময়ে উম্মতে মুহাম্মাদী এমন একজনকে হারিয়েছে, যাঁকে একদিক থেকে একুশ শতকের কিংবদন্তীর খেতাব দেওয়া যায়। মিডিয়া-জুড়ে যখন স্টিব জবসের মৃত্যুর খবর প্রচারিত হচ্ছে, সেই সময় এই মানুষটি চলে যান। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের খবর খুব কম লোকই জানতে পারে।

আজ আপনাদেরকে এমনই এক ব্যক্তির গল্প শোনাব। দুনিয়ার জীবনে তিনি হয়তো যোগ্য আসন পাননি। কিন্তু আমরা আশাবাদী—ওপারে ঠিকই পেয়ে গেছেন, বিইজনিল্লাহ।

বলছি ডা. আবদুর রহমান সুমাইত ﵀-এর কথা। তিনি কুয়েতের একজন ডাক্তার; মেডিসিন এবং সার্জারি-বিশেষজ্ঞ ছিলেন। পড়াশোনা করেছেন বাগদাদ ইউনিভার্সিটি থেকে। আট-দশ জন ছাত্রের মতো তিনিও স্নাতক সমাপ্ত করেন। এরপর পাড়ি জমান ইংল্যান্ডে। University of Liverpool থেকে Tropical diseases এর ওপর ডিপ্লোমা কোর্স করেন ১৯৭৪ সালে। এরপর স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করেন কানাডার Magil University of Montreal বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই ধাপে তিনি internal diseases এবং gastro enterology the digestive system এর ওপর বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন।

এগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো, আমার-আপনার মতোই খেটে-খাওয়া-মানুষ ছিলেন ডা. আবদুর রহমান সুমাইত। বিয়ে করেছিলেন এক নারীকে, যার ডাক-নাম উম্মু সুহাইব। অর্থাৎ সুহাইবের মা। ডা. সুমাইত ছিলেন 'আবূ সুহাইব', আর তাঁর স্ত্রী উম্মু সুহাইব। সুখের সংসার ছিল তাঁদের।

উম্মু সুহাইব ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার মহিলা। একদিন তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, 'সুহাইবের বাবা, একটা কথা। আমি চাই না আট-দশজন লোকের মতো স্রেফ খেয়েপরেই আমাদের জীবনটা কেটে যাক। এর চেয়েও মহৎ কোনো উদ্দেশ্যে আমাদের

সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই আমাদের আরও বড়ো কিছু করতে হবে।' স্বামী জানতে চাইলেন, 'প্রিয়তমা, তুমি কী ভাবছ? আমাকে বলো।' স্বামীর বিস্ময় ভেঙে দিয়ে স্ত্রী বললেন, 'আমি মনে করি, আমাদের উচিত মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, দাওয়াহ দেওয়া। আপনি কী বলেন?' আবূ সুহাইব বললেন, 'আমিও তাই মনে করি, আমাদের আসলেই উচিত মানুষদের আল্লাহর পথে আহ্বান করা।' স্বামীকে রাজি হতে দেখে স্ত্রী ভীষণ খুশি—'চমৎকার! তা হলে চলুন, আমরা পূর্ব-এশিয়ায় যাই আর সেখানে আমাদের বাকিটা জীবন উজাড় করে দিই! আমি শিক্ষকতার পাশাপাশি দাওয়াহ দিলাম। আর আপনি ডাক্তারি পেশা চালিয়ে গেলেন, সাথে সাথে দাওয়ার কাজও করলেন। আল্লাহ যদি আমাদের মধ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখতে পান, তা হলেই আমরা সফল।'

আল্লাহ বলেন,

إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ

> 'যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালো কিছু দেখেন, তা হলে তোমাদের থেকে যা নেওয়া হয়েছে তা থেকে তিনি অনেক বেশি দেবেন।'[১]

এ সময় কুয়েতের প্রাক্তন আমীর জাবির-এর স্ত্রী ডা. সুমাইতকে ডেকে পাঠান। তিনি ডা. সুমাইতকে বলেন, 'আমার জমানো কিছু টাকা আছে। ওগুলো আপনাকে দিতে চাই। এই টাকা নিয়ে আপনি আফ্রিকায় যাবেন। আর আমার নামে একটা মাসজিদ করবেন। আমি চাই মাসজিদের নির্মাণকাজ আপনি নিজেই তদারকি করবেন।' তিনি সেই অর্থ গ্রহণ করে বিদায় নেন। এরপর মাসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে চলে যান আফ্রিকায়।

আফ্রিকা মহাদেশের এক শহরে অবতরণ করেন তিনি। এরপর শুরু করেন মাসজিদ নির্মাণকাজ। কাজের ফাঁকে আফ্রিকার কিছু গ্রামও হেঁটে হেঁটে দেখতে থাকেন। এসময় তিনি যা দেখলেন, তাতে প্রচণ্ড বিস্ময়, হতাশা ও আতঙ্ক অনুভব করলেন। এতকাল বইপুস্তকে যা পড়েছেন সব যেন চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছেন। তিনি এমন মুসলিমদের দেখা পান, যারা জানে না কীভাবে সূরা ফাতিহা পড়তে হয়। এমন মুসলিমও আছে, যারা জানে না ইসলামের আরকান কী কী, জানে না সালাত কীভাবে পড়তে হয়; সাওম-হাজ্জ-যাকাতের কথা বাদই দিলাম। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো একদমই ভুলে গেছে তারা।

ডা. আবদুর রহমান বলেন, 'শুধু তাই নয়, দেখলাম মাসজিদের ইমামগণ মাসজিদের ভিতরে যিনায় লিপ্ত। তারা জানেই না এগুলো হারাম। সাথে আছে অমুসলিমরাও।' এ ছাড়া আরও যা কিছু দেখলেন, সবই ছিল খারাপির শীর্ষে। শিরক আর পৌত্তলিকতায়

[১] সূরা আনফাল, ৮ : ৭০

ছেয়ে গেছে গোটা সমাজ। দেখলেন, মানুষজন চাঁদ তারার পূজা করছে। সাজদা দিচ্ছে গাছকে, সেই সাথে একে অপরকেও। স্রষ্টার ধারণা তাদের অন্তর থেকে যেন সমূলে উঠে গেছে। খ্রিস্টান মিশনারিরাও এসেছে আফ্রিকায়। তাদের দাওয়াত পেয়ে টাকার লোভে গ্রামের লোকজন ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হতে শুরু করল। তারা আপন ধর্ম ছেড়ে দিচ্ছে কেবল খাদ্য পানির অভাবে, থাকার কোনো জায়গা না পেয়ে। তানযানিয়া, মালাবি, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ সুদান, নাইগার ইত্যাদি জায়গায় তিনি এসবের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে এলেন।

এসব দেখার পর ডা. সুমাইত মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়লেন। যেন আত্মযন্ত্রণায় তার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে উম্মতের এই করুণ দশা দেখে। দেশে ফিরে আর দেরি করলেন না। উম্মু সুহাইবকে খুলে বললেন কষ্টের কথাগুলো। কাতর-কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের অবশ্যই এসব নিয়ে কিছু করা উচিত।' স্ত্রী বললেন, 'আমরা কী করতে পারি?'

হ্যাঁ, সেদিন থেকেই ডা. সুমাইত আফ্রিকার মানুষগুলোর হিদায়াতের জন্য উৎসর্গ করে চললেন তাঁর জীবন, সময়, শ্রম, অশ্রু, সম্পদ—সবকিছু। সমস্ত-কিছু আল্লাহর জন্য, আল্লাহর পথে দাওয়াতের জন্য ঢেলে দিয়েছেন উম্মতের এই দরদী পিতা। মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পেতে নয়, এসব তিনি একাই করেছেন নিজ পরিবারকে সাথে নিয়ে। এভাবেই আফ্রিকায় শুরু হয় তাঁর জীবনের নতুন একটি অধ্যায়। ড. আবদুর রহমান সুমাইত ﵀-এর অভিজ্ঞতার কিছু অংশ আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি :

ড. মূসা শারিফ হাফিযাহুল্লাহ পরিচালিত একটি ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ড. আবদুর রহমান। সেই অনুষ্ঠানে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে এমন কিছু কথা বলেন, যা আমাদের চিন্তার বাহিরে। তিনি বলেন, 'কিছু গ্রামে আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়াটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই গ্রাম এবং আমাদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এক বিশাল নদী। বদ্ধ নদী হলেও এতে পানি ছিল বেশ। কিন্তু ময়লা, আবর্জনায় এত টইটম্বুর যে, পানি একদম কালো হয়ে গেছে। সব রকমের রোগ-বালাই আর পোকামাকড়ের আস্তানায় পরিণত হয়েছে। হেঁটে হেঁটে এই নদী পার হওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তাও ছিল না আমাদের সামনে।'

তিনি বলেন, 'আমরা নদীতে নামি। ধীরে ধীরে এর পানিও আমাদের গলা পর্যন্ত উঠে আসে।' উপস্থাপক প্রশ্ন করেন, 'নদীর ওপারে পৌঁছোতে এভাবে কতক্ষণ হাঁটতে হয়েছিল?' শাইখ বলেন, 'দুই থেকে চার ঘণ্টা।'

প্রিয় পাঠক, ভেবে দেখুন। তিনি একজন ডাক্তার! tropical diseases এর ওপর তার ডিগ্রি রয়েছে! খুব ভালোকরেই জানেন, বিষাক্ত পানিতে এতক্ষণ থাকা কতটা

বিপজ্জনক।

ড. আবদুর রহমান বলেন, 'আফ্রিকার কাঁচাপথ মাড়িয়ে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে কখনও কখনও ২০০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার হাঁটতে হয়েছে আমাদের। আবার এমনও হয়েছে, তিনদিন পেরিয়ে গেছে কিন্তু খাওয়ার মতো কিছু পাইনি। মনে পড়ে একবার আমি হাঁটু গেড়ে বসেছিলাম দুর্গন্ধ আর আবর্জনায় ভর্তি একটা পুকুরের ধারে। হাত দিয়ে গর্ত করছিলাম এই আশায়, যদি গলা ভেজানোর মতো একটু পরিষ্কার পানি পাই...

সত্যিই, দাওয়াতের পথ মোটেও মসৃণ নয়। কেনিয়া, মজাম্বিক এবং মালাবিতে ড. আবদুর রহমান কমপক্ষে তিনবার ভয়ঙ্কর বিষধর গোখরা সাপের ছোবলে পড়তে নিয়েছিলেন। প্রতিবার আল্লাহ তাঁকে অলৌকিকভাবে বাঁচিয়ে দেন। এ ছাড়া দুই-দুইবার তাঁকে গুপ্ত হত্যার চেষ্টা করা হয়, দুবার কারাবরণ করতে হয়, এবং মৃত্যুদণ্ডের শঙ্কা পর্যন্ত তৈরি হয়।

ডা. আবদুর রহমান ইন্টারভিউতে জানান, আফ্রিকা থেকে তিনি কী পরিমাণ রোগ-বালাই নিয়ে ফিরেছিলেন। প্রায়ই এমন গ্রামে যেতে দরকার হতো, যেখানে যেতে তিনি ট্রাকের পিছনে চেপে বসতেন। কিন্তু রাস্তা কাঁচা হওয়ায় ট্রাকের একপাশ থেকে আরেকপাশে ক্রমেই গড়িয়ে পড়েছেন। এভাবে ধাক্কা খেতে খেতে গেছেন পুরোটা পথ!

কেন? কেন তিনি এতটা কষ্ট স্বীকার করছিলেন? কারণ, তিনি আল্লাহর কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সস্তা মূল্যের বিনিময়ে নয়, বরং রাজাধিরাজ আল্লাহর জন্য নিজেকে বিক্রি করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা এই শ্রেণীর মানুষদের ব্যাপারে বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝

'আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেকে সঁপে দেয়। আর আল্লাহ (তাঁর) বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।'[২]

সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ চমৎকার কিছু কথা বলেছেন বিলাল ﷺ সম্পর্কে—বিলাল ইসলামের জন্য বুকে পাথরের চাপা সহ্য করেছেন। ওপরে কয়লার মতো গরম পাথর, আর নিচে তপ্ত বালু, এভাবে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা শুয়ে থাকতে হয়েছে তাঁকে মরুভূমিতে। সেই নির্যাতনের কথা স্মরণ করে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন,

إِلَّا بِلَالًا، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ

[২] সূরা বাকারাহ, ২ : ২০৭

"..বিলাল হলো সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে আল্লাহর জন্য সঁপে দিয়েছিল।"[৩]

ড. আবদুর রহমান বলেন, 'একবার আমরা একটা গ্রামে যাই। সেখানে তখন তীব্র খরা চলছিল। চারিদিকে পানির জন্য হাহাকার। এই সময়ে আমরা উপস্থিত। কিন্তু গ্রামের সরদার আমাদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিল না। আমরা তাকে খুব করে অনুরোধ করলাম। সে বলল, 'ঠিক আছে ঢুকতে দেব; তবে এক শর্তে, যদি তোমাদের স্রষ্টাকে বলে আমাদের গ্রামে বৃষ্টি বর্ষণ করাতে পারো, তা হলে।' ড. আবদুর রহমান বললেন, 'দয়া করে আমাদের এমন শর্ত দেবেন না। বৃষ্টি হওয়াটা আমার-আপনার কারোর হাতেই নেই।'

সরদার বলল, 'ঠিক আছে, তা হলে তোমরা চলে যাও'। শাইখ বলেন, 'আমাদেরকে একটি সুযোগ দিন প্লিজ!' কিন্তু গ্রামের সরদার নাছোড়বান্দা, 'তোমাদের স্রষ্টাকে বলো বৃষ্টি বর্ষণ করতে।' শাইখ আবারও বললেন, 'বৃষ্টি হওয়া-না হওয়া আমার সামর্থ্যে নেই।' কিন্তু সরদার আপন সিদ্ধান্তে অনড়। ডা. আবদুর রহমান বলেন, 'সে আমাদেরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিল। এই দিকে আমার অন্তরে যে কী পরিমাণ কষ্ট অনুভূত হচ্ছিল, তা শুধু আল্লাহই জানেন। আমার সাথিদের দিকে তাকালাম, তারা আমার দিকে চেয়ে আছে। কী করব আমরা? কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

এরপর তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর কাছে হাত পাতলাম। ভিক্ষা চাইতে থাকলাম এবং মন থেকে ডাকতে থাকলাম। প্রচুর পরিমাণে কাঁদলাম এই বলে, "রব আমার! আমার পাপের কারণে আপনার বান্দাদের ঈমান থেকে বঞ্চিত করবেন না।" আমি কাঁদতে কাঁদতে আকাশের দিকে তাকালাম, লক্ষ করলাম—হঠাৎ মেঘ জমা হতে শুরু করেছে। ক্রমেই আকাশ কালো হয়ে এলো। বজ্রপাত শুরু হলো, সেই সাথে ঝড়ো বাতাস। এরপর আকাশ ফেটে অঝোরে বৃষ্টি বর্ষণ হলো সেদিন। আল্লাহু আকবার!'

আফ্রিকার এই লোকগুলো জীবনেও এরকম বিস্ময়কর কিছু ঘটতে দেখেনি। তারাও হতবিহ্বল হলো। সদরদারসহ পুরো গ্রামবাসী ইসলামে প্রবেশ করল।

ড. আবদুর রহমান সুমাইত-এর এক আদুরে নাতনী ছিল। কুয়েতে পড়াশোনায় বেশ নাম কামিয়েছিল সে। তো নানাজান তাঁর নাতনীকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। পুরস্কারটা কিন্তু সিনেমার টিকেট, ভাউচার, কিংবা খেলনা পুতুল ছিল না। সেটি ছিল আফ্রিকার টিকেট। তিনি তাকে আফ্রিকায় আসার আমন্ত্রণ জানান। বলেন, 'এখানে আসো! আমার সাথে কিছু সময় দাও দাওয়াতি কাজে। এটাই তোমার পুরস্কার।' তেরো বছর বয়সী এই বালিকা আপন ভূমি ছেড়ে চলে আসে সুদূর আফ্রিকায়। গিয়ে তার আত্মীয়দের সাথে

---

[৩] ইবনু মাজাহ, ১৫০; আহমাদ, ৩৮২২; সহীহ

সাক্ষাৎ করে। সেখানে সে অবস্থান করে কয়েক সপ্তাহ। ওর ওছিলায় এই অল্প সময়ে ২৭ জন ব্যক্তি শাহাদাত পাঠ করে, আলহামদু লিল্লাহ। দেখুন শাইখের আদর্শ! তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তার পরবর্তী প্রজন্মকেও ঈমানের আলোয় আলোকিত করে গেছেন। ইয়া সালাম!

ড. আবদুর রহমান বলেন, 'আমি সেই মুহূর্তটা কখনও ভুলতে পারব না, যেদিন আমি এবং আমার স্ত্রী উম্মু সুহাইব মাদাগাস্কারের একটি ছোট্ট কুটিরে ছিলাম। মধ্য রাতে আমরা একসাথে বসে আছি বাড়ির আঙিনায়। আমি তার চেহারার দিকে তাকাই। চেহারাজুড়ে অবসাদ আর ক্লান্তির ছাপ। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম।'

'উম্মু সুহাইব, অনেক ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। তুমি কি হাল ছেড়ে দিয়েছ?'

'আবূ সুহাইব, আমি আপনাকে বলব এইমাত্র আমি কী ভাবছিলাম?'

'হুম, বলো।'

'আমি ভাবছিলাম, আল্লাহ যদি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেন, আমরা কি সেদিন ঠিক এই পরিমাণ সুখী হতে পারব যতটা সুখ আজ অনুভব করছি?'

কথায় আছে, প্রত্যেক সফল ব্যক্তির পেছনেই একজন নারী থাকে...

দেখতে দেখতে ড. আবদুর রহমান সুমাইত জীবনের তিরিশটি বছর ঢেলে দিলেন আফ্রিকা মহাদেশে। দ্বীনের রাহে ব্যয় করলেন সামর্থ্যের সবটুকু। আল্লাহর শপথ, তার অর্জন এতটা বিস্ময়কর ছিল যে, বিলিয়ন বাজেট নির্ধারণকারী জাতিও তা অর্জন করতে পারেনি। দাওয়াতি কার্যক্রমের তিরিশ বছরে আবদুর রহমানের ফিরিস্তি ছিল বিশাল। তিনি ৫৫০০ মাসজিদ নির্মাণ করেছেন, ৫০,০০০ ইয়াতিমের ভরণপোষণ দিয়েছেন, যাদের অনেকেই এখন ডাক্তার এবং আইনজীবী। ড. আবদুর রহমান বিতরণ করেছেন প্রায় ৭০ লক্ষ কুরআন। প্রতিষ্ঠা করেছেন ৮৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছোটোদের নার্সারি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, যা আজ আফ্রিকার ৫ লক্ষেরও অধিক ছাত্রের আবাস। ড. আবদুর রহমান নিজে খনন করেছেন এবং খনন করিয়েছেন এমন টিউব ওয়েলের সংখ্যা ১২০০০ এর কম নয়, এবং নির্মাণ করেছেন ৯০টি হাসপাতাল এবং ফার্মেসি।

আর কত লোক তাঁর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছে, সেই সংখ্যা কেবল আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তবে তাঁর সঙ্গীদের অনুমান, শাহাদাত পাঠকারীদের সংখ্যা অন্তত এক কোটি!

এত বড়ো বড়ো অর্জন, এগুলোর কোনোটাই সহজ ছিল না। এজন্য তাঁকে হারাতে হয়েছে অনেক সঙ্গী-সাথি, নির্ঘুম কেটেছে বহু রাত্রি। দুনিয়াবী স্বপ্নকে মাটি করে দিতে

হয়েছে। দিতে হয়েছে শারীরিক শ্রম। শরীরে বাসা বেঁধেছে অসংখ্য রোগব্যাধি। ফলে প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ২০টি করে ট্যাবলেট খেতে হতো তাঁকে। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এসে ড. আবদুর রহমানকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে দৌড়াতে হয়েছে নিজের চিকিৎসার জন্যে। আরও আগে থেকেই নিজের প্রতি মনোযোগী হওয়া দরকার ছিল, কিন্তু উম্মতের চিন্তায় এই দরদী পিতা ভুলে গেছেন নিজের কথা। এখন মৃত্যু তার দরজায় কড়া নাড়ছে; আফ্রিকা থেকে কুয়েত গেলেন, কুয়েত থেকে জার্মানি। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে। সবশেষে ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে একটি ঘোষণা ভেসে এলো, ড. আবদুর রহমান আর নেই... তিনি ইন্তেকাল করেছেন...

আল্লাহ তাআলা রহম করুক শাইখের ওপর, আমাদের পিতার ওপর। রহিমাহুল্লাহু তাআলা। আল্লাহ তাঁর হাশর করুক নবি-রাসূলদের সাথে, শহীদ এবং সিদ্দীকদের সাথে।

পাঠক একটিবার ভেবে দেখুন, একটি ডিগ্রির পেছনে হাজার হাজার টাকা আপনি ইউনিভার্সিটিতে ঢালছেন। এরপর গ্রাজুয়েশনও সমাপ্ত করলেন। কিন্তু চাকরির বাজারে নামতেই আবিষ্কার করলেন, এই ডিগ্রির কোনো মূল্য নেই। তখন আপনার কেমন লাগবে? কল্পনা করুন, যে পরীক্ষার জন্য আপনি ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা, রাতের-পর-রাত জেগে প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে আবিষ্কার করলেন যে, আপনি ভুল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছেন! তখন আপনার কেমন লাগবে? কল্পনা করুন, আপনি কয়েক বছর ধরে একটি সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। উঠছেন-তো-উঠছেন... এভাবে উঠতে উঠতে শেষ ধাপে এসে পেলেন দুর্ভেদ্য একটি দেওয়াল! তখন আপনার কেমন লাগবে?

এই তিনটি উদাহরণের আলোকে সবাই যদি নিজেকে প্রশ্ন করি, আমার উদ্দেশ্য কী? আমার লক্ষ্য কী? আমি কী করছি? যে জিনিসের পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে যাচ্ছি, এর শেষটা যদি হয় এমনই হতাশা এবং আফসোসের, তখন আমি কী করব? ফিরে কি পাব খুঁইয়ে-ফেলা এই সময়? ফিরে পাব সুযোগ? কমাতে কি পারব কলিজা-ফাটা বেদনা আর আফসোস?

মূল সমস্যা দুটি শব্দেই প্রকাশ করা যায়—'লক্ষ্য নির্ধারণ'। আপনার জীবনের লক্ষ্য কী? একজন মুমিনের স্থানে দাঁড়িয়ে আপনি যখন জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন, কীভাবে বুঝবেন আপনার লক্ষ্য সঠিক? কিংবা আপনার গন্তব্য সঠিক পথে এগোচ্ছে—কীভাবে যাচাই করবেন? কিয়ামাতের দিন আফসোস করা থেকে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন? বুকফাটা আর্তনাদ থেকে কীভাবে বাঁচাবেন নিজেকে?

সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের মানদণ্ড কী হবে? ব্যক্তির অর্জিত অর্থ-সম্পদের দ্বারা কি নির্ধারণ করা হবে, না যে স্টেটাস এবং সম্মান সে অর্জন করেছে—তা দ্বারা? ইসলামি মানদণ্ড কী?

ধরতে পারছেন সমস্যা কোথায়? বাস্তবে আমরা হয়তো কেউই নিজেদেরকে প্রশ্নগুলো করি না। দুনিয়া অর্জনে আমাদের অস্থিরতা, দুনিয়াকে ঘিরে সাজানো এই জীবন আমাদেরকে ভুলিয়ে দেয়। সত্যি বলতে, ঠিক সেদিনই আমরা সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারব। যেদিন হাশরের ময়দানে একত্র হব, বুঝতে পারব দুনিয়ার জীবন কতটা মূল্যবান ছিল। সেদিন বাস্তবতা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। জীবনের আসল অর্থ-মর্ম ওইদিন বোঝে আসবে। মিলবে চূড়ান্ত প্রতিদান। বুঝতে পারব, কত বড়ো সুযোগ আমরা হেলায় নষ্ট করেছি। কিয়ামাতের দিন, আসল হার-জিতের দিন আমরা সব বুঝতে পারব। খুব দূরে নয় সেদিন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾

'আর তুমি যদি দেখতে, যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে মাথানত হয়ে থাকবে (তারা বলবে) "আমাদের রব, আমরা দেখেছি ও শুনেছি, কাজেই আমাদেরকে পুনরায় পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। নিশ্চয় আমরা দৃঢ়-বিশ্বাসী।'"[৪]

অপরাধীরা বলবে, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ! এখন আমরা শুনতেও পাচ্ছি। কাজেই আমাদেরকে ফিরিয়ে দিন!

সূরা ক্বফ-এ আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

"এ ব্যাপারে তুমি অজ্ঞ ছিলে। তাই তোমার সামনে যে আবরণ ছিল তা আমি সরিয়ে দিয়েছি। তাই আজ তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।"[৫]

বিচার-দিবসে আল্লাহ তাআলা এক পাপী বান্দাকে বলবেন, তুমি গাফেল ছিলে। এই দিনের অপেক্ষায় ঘুমিয়ে ছিলে। আজ আমি তোমার দৃষ্টির পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, এখন তুমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। আয়াতে আল্লাহ حَدِيدٌ (হাদীদ) শব্দটি উল্লেখ করেছেন। এর শাব্দিক অর্থ হলো লোহা। অর্থাৎ তোমার দৃষ্টি আজ লোহার মতো তীক্ষ্ণ হবে। এখন তুমি সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ।

---

[৪] সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১২
[৫] সূরা ক্বফ, ৫০ : ২২

ভাই-বোনেরা, দুনিয়ার জীবনে আমরা নিজেদের লক্ষ্য নিজেরা নির্ধারণ করতে পারি না। কেননা কোনোকিছুর বাস্তবতা তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। বরং আমাদের কর্মের আসল ফলাফল এখন আমাদের দৃশ্যের বাইরে। কেবল কিয়ামাতের দিনই প্রতিটি কাজের ফলাফল দেখতে পাব। তাই জীবনের লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী, তাঁর বিধান মোতাবেক।

আমরা আবার সেই প্রশ্নে ফিরে যাচ্ছি, সুন্দর লক্ষ্য কী? কিংবা বলতে পারি, সাফল্যের সংজ্ঞা কী? জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের গুরুত্ব আপনাদেরকে, আপনাদের পরিবার, আত্মীয় এবং সন্তানদের বোঝাতে যদি সক্ষম হয়ে থাকি—তা হলে শুনুন, জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, আল্লাহর কালাম থেকেই শুনুন; কুরআনের তৃতীয় সূরা, সূরা আ ল ইমরানের ১৮৫ আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ,وَ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

> ‘প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর অবশ্যই কিয়ামাতের দিন তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে।’

এরপর আল্লাহ তাআলা বলছেন জীবনের লক্ষ্য নিয়ে :

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

> ‘সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন তো শুধু ধোঁকার সামগ্রী।’

সাফল্য এটাই। সাফল্য ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করতে পারা নয়, সাফল্য বড়ো ব্যবসায়ী হওয়া, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির CEO কিংবা সংসদের এমপি হওয়ায় নয়। তেমনি সাফল্য বিয়ে করতে পারা নয়, সন্তানের বাবা-মা হওয়া কিংবা নোবেল প্রাইজ জেতা নয়। বরং দুনিয়ার জীবনের তাবত সফলতা যদি আখিরাতের জীবনে সফলতা বয়ে আনতে না পারে, তা হলে এগুলো সবই ব্যর্থতা, কোনো মূল্য নেই এসবের। এটাই আল্লাহর নির্ধারিত মানদণ্ড। ওপারে এই মানদণ্ডেই আমাদের কর্মের ওজন হবে, ফলাফল ঘোষণা হবে।

হ্যাঁ, আবদুর রহমান সুমাইত ﷺ-এর জীবন-মরণও ছিল এই মানদণ্ডকে ঘিরে। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট, অর্জনও করেছেন তেমনটাই বিইযনিল্লাহ।

ভাই আমার, দুজন মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য সর্বদা ইলমের ভিত্তিতে রচিত হয় না। বক্তৃতায় কে উত্তম—এটার ওপর না। এমনকি ঈমান এবং ইখলাসের তারতম্যের

কারণেও নয়। হতে পারে উভয়ই এগুলোতে সমান। একজন আখিরাতের প্রতি অত্যন্ত সচেতন মুসলিম, আর অপরজন পিছিয়ে-পড়া গড়পড়তা মুসলিম—এই দুজনের মধ্যে পার্থক্য কখনও স্রেফ একটি কারণে সূচিত হয়, আর তা হলো 'লক্ষ্য'। একজনের লক্ষ্য সুস্পষ্ট এবং সেদিকেই ধাবিত। আর অপরজনের দিনগুলো নিত্যদিনের মতই, নেই কোনো পরিবর্তন।

স্বাস্থ্যের কথা যদি বলি, আমাদের অধিকাংশের স্বাস্থ্য ভালো। অপরদিকে আবদুর রহমান সুমাইত ﷺ-এর ডায়াবেটিকস ছিল, উচ্চ রক্ত চাপ ছিল, দুই দফা তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং তিনবার রক্ত জমাট বেধে গিয়েছিল। একবার হার্টে হয়েছে, আরেকবার মস্তিষ্কে। আর এই সমস্ত বিপদ তাঁর সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

সম্পদের কথা ধরলে, আমাদের অনেকের সম্পদ তাঁর চেয়ে বেশি। যৌবনের মানদণ্ডে আমাদের অধিকাংশই ড. আবদুর রহমানের চেয়ে যুবক। তা হলে পার্থক্য কোথায়?

কবি আল-মুতানাব্বি বলেন,

وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَاراً — تَعِبَتْ فِي مُرَادِهَا الأَجْسَامُ

জীবনের লক্ষ্য যদি বড়ো কিছু হয়,
শরীর তখন পরিশ্রম প্রিয় হয়।'[৬]

ভাই-বোনেরা, আপনাদের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করছি, একজন গড়পড়তা মুসলিম হবেন না। প্রতিযোগিতার মাঠে পিছিয়ে থাকবেন না। আপনার জন্য সহজ এমন কিছু করুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কীসে দক্ষ? কোন কাজে পারদর্শী? মন থেকে খুঁজে বের করুন। আমি জানি এটা মোটেও সহজ নয়। কেননা এর জন্য নিজের সাথে সৎ হতে হবে, লক্ষ্য পূরণের জন্য এলোমেলো জীবন ছেড়ে আপনাকে শৃঙ্খল জীবন যাপন করতে হবে। আমি জানি এটা কঠিন। কিন্তু আল্লাহর কসম, কাল কিয়ামাতের দিন এটাই আপনাকে সর্বোত্তম ফলাফল এনে দেবে। লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, আপনার বয়স যতই হোক। আপনি পুরুষ কিংবা নারী যা-ই হোন।

আবারও বলছি, নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনার জীবনের লক্ষ্য কী? আগামী দশ বছরে আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান? যদি ইঙ্গিত পেতে চান দশ বছর পর আপনি কী হবেন, তা হলে নিজেকে প্রশ্ন করুন, দশ বছর আগে আমি কেমন ছিলাম? দশ বছর আগের আপনি আর আজকের আপনির মধ্যে যদি তেমন কোনো পার্থক্য না পান, তা

[৬] দিওয়ানুল মুতানাব্বি, ২/২৪৫

হলে খুব সম্ভব দশ বছর পরেও আপনি এমনই থাকবেন।

লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার অধিকারী আলিমদের স্মরণাপন্ন হন। তাদের কাছ থেকে জেনে নিন, আমার লক্ষ্য ঠিক আছে কি না। বলুন, আমার ছন্নছাড়া লক্ষ্যকে সাজিয়ে দিন, সময়সীমা নির্ধারণ করে দিন, সাফল্যের সূত্র শিখিয়ে দিন, চোরাবালি চিনিয়ে দিন। এরপর দেখুন আল্লাহ্ তাআলা আপনার জন্য সাফল্যের দুয়ার ঠিক সেভাবেই উন্মোচন করে দিচ্ছেন, যেভাবে দিয়েছেন ড. আবদুর রহমান সুমাইত ﵀-এর জন্য।

النَّفسُ تَبكي عَلَى الدُنيا وَقَد عَلِمَت—إِنَّ السَلامَةَ فيها تَركُ ما فيها

لا دارَ لِلمَرءِ بَعدَ المَوتِ يَسكُنُها—إِلّا الَّتي كانَ قَبلَ المَوتِ بانيها

فَإِن بَناها بِخَيرٍ طابَ مَسكَنُها—وَإِن بَناها بَشَرٍّ خابَ بانيها

'নফস কাঁদে দুনিয়ার জন্যে, যদিও সে ভালো করেই জানে
নিরাপদ তো সে, যে এখানে দুনিয়াবিমুখ থাকে।
মৃত্যুর পর আপনঘর হবে সেটাই, যা বানানো হয় মরণের আগে।
যদি নেক আমল দ্বারা তা বানানো হয়, তো (কবর) হবে সুখের বিছানা।
আর যদি বদ আমল দ্বারা তা বানানো হয়, তবে সে ব্যর্থ হবে।'[৭]

[আলি ইবনু আবী তালিব ﵁]

[৭] দিওয়ানু আলি, ২১০

সংশয়মুক্ত ঈমান

মানুষের অন্তর সদা পরিবর্তনশীল। মুহূর্তে মুহূর্তে তা বদলায়। বদলানোই তার ধর্ম। মানব-হৃদয়ের এই অস্থিরতা চিরন্তন। সকালে যে ব্যক্তি মুসলিম, সন্ধ্যা গড়াতেই সে হয়তো কাফির। একদিন সকালে উঠে আপনি হয়তো ঈমানি জযবা অনুভব করলেন। অথচ ঘণ্টা কয়েক যেতেই দেখলেন, সেই আবেগ হারিয়ে গেছে! অন্তর কঠিন হয়ে গেছে।

মানুষের মন বড়োই জটিল প্রকৃতির। সম্ভবত এ জন্যই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'কলব'। সর্বদা সে 'তাকাল্লুব' অর্থাৎ পরিবর্তন হতে থাকে। প্রতিটা মুহূর্তেই সে রূপ পাল্টায়।

কবি বলেন,

وَمَا سُمِّيَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِأُنْسِهِ
وَلَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ

মানুষ ভুলোমনা, তাই তো সে ইনসান।'
অন্তর পরিবর্তনশীল, তাই তো এর নাম কলব।[৮]'

আমাদের নবিজি ﷺ আরও চমৎকার উপমা দিয়েছেন অন্তরের পরিবর্তন নিয়ে।

আবূ মূসা আশআরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلَاةٍ

'কলব (পাখির) পালকের মতো, ধু-ধু মরুতে বাতাস যাকে দিগ্‌বিদিক নিয়ে চলে।'[৯]

---

[৮] আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন, ৬৬
[৯] ইবনু মাজাহ : ৮৮; আল-জামিউ আস-সগীর : ১/১০৭৮; সহীহ

এটাই অন্তরের প্রকৃতি। এভাবেই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে অন্তর। এই অস্থিরতা অন্তরের একটি জটিল দিক মাত্র। এর আরেকটা দিক আছে; তা খুবই জটিল কিন্তু বাস্তব। আর সেটা হলো ফিতনা অর্থাৎ পরীক্ষা। হারাম খায়েশ তো সবার আগে অন্তরেই বাসা বাঁধে। কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই তা অন্তরে আবির্ভূত হয়। কখনও কখনও শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মাধ্যমেও হৃদয়ে ফিতনা প্রবেশ করতে পারে। যেমন : চোখ দিয়ে খারাপ কিছু দেখা, হাত দিয়ে হারাম জিনিস ধরা, কান দিয়ে অশ্লীল কিছু শোনা ইত্যাদি। মোটকথা, দেহের যে-কোনো অঙ্গই ফিতনায় লিপ্ত হতে পারে।

ফিতনার প্রাথমিক লক্ষ্য হলো মানুষের অন্তর। কারণ, এখানেই সে বাসা বাঁধে। এটাই তার আবাসস্থল। এজন্য নবিজি ﷺ আমাদের সাবধান করে গেছেন।

হুযাইফা ؓ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন,

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ

'চাটাইয়ের বুননের মতো একেক করে ফিতনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায় তাতে একটি করে কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করে তাতে একটি উজ্জ্বল দাগ পড়ে। এমনি করে দুটি অন্তর দু-ধরনের হয়ে যায়।'[১০]

একটি দুটি নয়, নবিজি বলেছেন ফিতনার-পর-ফিতনা আসতে থাকবে অন্তরের সামনে। ঠিক যেভাবে মাদুরের পাতাগুলো একে অপরের সাথে জুড়ে একটি পরিপূর্ণ মাদুরে রূপ নেয়। অন্তরও এভাবে নানামুখী ফিতনার সম্মুখীন হয়।

দ্বিতীয়ত, আমরা পরিবর্তনশীল যুগে বাস করছি। প্রতিনিয়ত পাল্টাচ্ছে সবকিছু। মত পাল্টে যাচ্ছে, মতবাদ পাল্টে যাচ্ছে, এমনকি বিশ্বাসও পাল্টে যাচ্ছে। তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ ، وَلَا آبَاؤُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ

'শেষ জামানায় আমার উম্মতের একদল মানুষ আসবে, যারা তোমাদের এমন কিছু বলবে, যা তোমরা ইতোপূর্বে শোনোনি। তোমাদের পূর্বপুরুষরাও

[১০] মুসলিম : ২৩৯

শোনেনি। কাজেই নিজেদের ব্যাপারে এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো।'[১১]

অন্যদিকে কিয়ামাতের দিন আমাদের সাফল্য নির্ভর করছে এমন একটি অন্তরের ওপর, যা থাকবে দৃঢ়। বিশ্বাসের দিক থেকে যার কোনো নড়চড় নেই। নদীতে দুলতে-থাকা নৌকার মতো কোনো অন্তর সফল হবে না। এ জন্য ইবরাহীম ﷺ তাঁর দুআয় বলেছেন,

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

'আর যেদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে, সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আসবে না কোনো কাজে। সেদিন শুধু সে উপকৃত হবে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।[১২]

ওপরে আলোচিত বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে সাজালে পাওয়া যায় :

১) আমাদের এমন একটি অন্তর আছে, যা সর্বদা পরিবর্তনশীল।

২) আমরা এমন এক পরিবেশে বাস করছি, যা ক্রমাগত পাল্টাতে থাকে।

৩) লোকেরা যা বলে আর আমরা যা শুনি, এগুলোও সর্বদা পরিবর্তন হতে থাকে।

৪) অন্তরে উপস্থিত হওয়া ফিতনাগুলোও পরিবর্তনশীল।

৫) অপরদিকে আল্লাহর কাঠগড়ায় মুক্তি পেতে হলে এমন একটি অন্তর নিয়ে উপস্থিত হতে হবে, যা অস্থিরতার ব্যাধি থেকে মুক্ত।

মোটকথা, যখনই কাউকে আত্মিক বিষয়, সংশয়-সন্দেহ, অন্তরের রোগ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুনবেন, তখন তা গুরুত্বের সাথে নিন। মন দিয়ে শুনুন। কারণ, বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে ইহকাল-পরকালের মুক্তির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

অন্তর মূলত দুই শ্রেণীর রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। রোগ-ব্যাধিগুলো এই দুই শ্রেণীর সাথে জড়িত। রোগগুলো হলো :

১. শাহওয়াত (প্রবৃত্তি বা হারাম লালসা)

২. শুবুহাত (সন্দেহ-সংশয় বা সাদৃশ্য অবলম্বন করা)

---

[১১] মুসলিম, মুকাদ্দিমা

[১২] সূরা শুআরা, ২৬ : ৮৭-৮৯

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন,

إن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه اذا استحكما فيه كان هلاكه وموته وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات هذان اصل داء الخلق الا من عافاه الله

'নিশ্চয়ই অন্তর শাহওয়াত ও শুবুহাত এই দুই প্রকার রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। যদি এর একটিও ব্যক্তির অন্তরে শক্তভাবে গেঁড়ে বসতে পারে, তা হলে অন্তরের ধ্বংস অনিবার্য, মৃত্যু সুনিশ্চিত। সকল রোগের সূত্রপাত এ দুটো বিষয় থেকেই ঘটে। তবে তার কথা ব্যতিক্রম, যাকে আল্লাহ বাঁচিয়েছেন।'[১৩]

প্রথমটি শাহাওয়াত বা প্রবৃত্তি। যেমন : বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কামনা, খাদ্য-পানীয়র চাহিদা, অর্থবিত্তের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, দ্রুত ধনী হবার তাড়না—এগুলো সবই প্রবৃত্তির অংশ। কখনও এসব চাহিদা হালালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, আবার কখনও তা হারাম পর্যায়ে উপনীত হয়। তখন এগুলো নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর।

দ্বিতীয়টি শুবুহাত বা সংশয়। এটি আরও ভয়ানক, অত্যন্ত বিপজ্জনক। সংশয় সরাসরি আপনার ঈমানের ওপর আঘাত হানতে পারে। পাল্টে দিতে পারে আপনার বিশ্বাস, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি। রবের সাথে আপনার যে সম্পর্ক, এর ওপর সরাসরি প্রভাব খাটাতে পারে। শারঈ হিজাবের ব্যাপারে আপনাকে অনাগ্রহী করে তুলতে পারে। এজন্য বিষয়টি অত্যন্ত বিপজ্জনক।

শুবুহাত শব্দটি شبه থেকে এসেছে। বাংলায় একে সংশয় বলা হলেও আরবি ভাষা অনুযায়ী তার আরেকটি পরিচয় হলো সাদৃশ্য অবলম্বন করা। অর্থাৎ, এমন-কিছুকে সত্য বলে মনে করা হয়, যা আসলে সত্য নয়। ফলে শুবুহাতে আক্রান্ত ব্যক্তি খারাপ কাজকেও ভালো মনে করতে থাকে। তাই সে খারাপ কাজ করার পরও লজ্জিত হয় না। পরন্তু নিজ কর্মের পক্ষে সাফাই গাইতে থাকে। যেমন ধরুন কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করার বিষয়টা। অনেকেই কাফিরদের চালচলন অনুসরণ করে। এটা যে স্পষ্ট হারাম, সে কথা কানেও তুলতে চায় না। বরং এর পক্ষে যুক্তি প্রদান করে। আসলে এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি শুবুহাতে আক্রান্ত হয়েছে, তাই এমনটা করছে।

এজন্য ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ শুবুহাতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন,

وإنا سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها ، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل

---

[১৩] মিফতাহু দারিস-সায়াদাহ : ১/১১০

> 'সাদৃশ্য অবলম্বনকে শুবুহাত নাম দেওয়ার কারণ হলো, বাতিলকে হকের সাদৃশ্য মনে করা। অনেকটা বাতিলের শরীরে হকের পোশাক পরানোর মতো।'[১৪]

সে যেন ছদ্মবেশী শয়তান, কিন্তু ভান ধরেছে ফেরেশতার। এটাই শুবুহাতের প্রকৃতি।

আপনি যদি শাহাওয়াত তথা প্রবৃত্তির মোহে নিমজ্জিত ভাই-বোনদেরকে কুরআন, হাদীসের বাণী কিংবা জান্নাত-জাহান্নামের কথা বলে নসীহা করেন, তো তাদের অন্তর কেঁপে উঠবে। চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত দেখতে পাবেন। তারা নিজেদের পাল্টানোর তামান্না প্রকাশ করবে। আর যদি নাও করে, তবু তাদের মধ্যে কিছু-না-কিছু অনুশোচনা কাজ করবে। কারণ, তারা হয়তো প্রবৃত্তি দ্বারা আক্রান্ত, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলকে তারা সত্য মানে। আখিরাতকে বিশ্বাস করে, কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে মানে। ফলে পাপের পরিমাণ যতই হোক না কেন, এগুলোর স্মরণ তাদের অন্তরকে আলোড়িত করবেই।

পক্ষান্তরে যারা শুবুহাতে আক্রান্ত, তাদের বেলায় আমরা অনুরূপ কথা বলতে পারি না। তারা নিজেদের অন্যায় কাজের পক্ষে তর্ক করবে। কারণ, এটাকে তারা খারাপ মনে করে না। 'আমাদের কাছে দলিল আছে' বলবে। আমি ওমুক লেকচারে এটা হালাল বলতে শুনেছি, বা ওমুক বইতে পড়েছি। অথবা বলবে, এ যুগে এসব চলে না। আউযুবিল্লাহ।

কাজেই শুবুহাত অত্যন্ত ভয়ানক একটি বিষয়। বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে আমাদের ঈমানের। তাই শুবুহাত অন্তরে জেঁকে বসার আগেই, আমাদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। এখন আমরা জানব, কীভাবে শুবুহাত থেকে বেঁচে থাকতে হয়।

চারটি মূলনীতি রয়েছে। এগুলোর অনুসরণ অন্তরে শুবুহাত বা সংশয়ের আগমন ঠেকাবে। আপনি যদি নিজেকে নিরাপদ মনে করেন, তবুও এই চারটি মূলনীতি স্মরণে রাখুন। যাতে আল্লাহ আপনাকে আমাকে ভবিষ্যতেও নিরাপদ রাখেন। আর যদি এই মুহূর্তে কোনো ধরনের সংশয়ে আক্রান্ত হয়ে থাকেন কিংবা কোনো কিছু শোনা বা পড়ার কারণে সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়ে থাকেন, তবে চিন্তার কিছু নেই। আপনার জন্যও আরও চারটি মূলনীতি রয়েছে। এগুলো দিয়ে আপনার ভেতরটা একদম ধুয়ে-মুছে সাফ করে ফেলুন।

সত্যি বলতে কী, এ আলোচনার গুরুত্ব তারাই সব থেকে বেশি বুঝবে, যারা এই মুহূর্তে সংশয়ে আক্রান্ত। আপনি যদি সংশয়ে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তা হলে অবশ্যই মনে মনে বলছেন, আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে ঔষধ দিন। কারণ, আমার সালাত আর আগের মতো নেই। আমার সিয়াম, সদাকা করার আকাঙ্ক্ষা আর আগের মতো নেই।

---

[১৪] মিফতাহু দারিস-সায়াদাহ : ১/১৪০

হালাকা, লেকচারে উপস্থিত হবার মতো উদ্যম আর জাগে না। আমার অন্তর একেবারে পাল্টে গেছে। আমি এ থেকে বের হয়ে আসতে চাই।

আমরা মোট আটটি মূলনীতি আলোচনা করব। প্রথম চারটি সংশয় থেকে বেঁচে থাকার উপায় নিয়ে। পরের চারটি সংশয়ে আক্রান্ত হওয়ার পর করণীয় বিষয় নিয়ে। এই আটটির ভিতর প্রথম চারটি আপনার অবশ্যই এখন কাজে লাগবে। অথবা আপনার পরিবারের কেউ যদি আক্রান্ত হয়ে থাকে, তারও কাজে লাগবে। তবুও ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকার জন্য হলেও এগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন।

কারণ, আমরা জানি না আল্লাহ আমাদের তাকদীরে কী ধরণের পরীক্ষা রেখেছেন। আজ হয়তো নিজেকে আমার দৃঢ় ঈমানের অধিকারী মনে করছি। আমার ভিতর কোনো সংশয় দানা পরিমাণও নেই। আমি আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত। আমি মৃত্যুতে বিশ্বাসী, পরকালে বিশ্বাসী, জান্নাত-জাহান্নাম বিশ্বাস করি। আমার কোনো সমস্যাই হয়তো নেই। তবুও চারটি মূলনীতি আমাদের জানতে হবে।

সংশয় থেকে বেঁচে থাকার উপায় :

১) সদা সতর্ক থাকুন

সব সময় সতর্ক থাকুন। ভুলে যাবেন না সংশয় বলে একটি বিষয় আছে, যার ব্যাপারে মনোযোগ রাখা জরুরি। ক্ষণিকের জন্যও গাফেল হবেন না। তা হলেই আমরা আশা করতে পারি, আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন।

আল্লাহ তাআলা বানী ইসরাঈলের ব্যাপারে বলেছেন,

وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا

> 'তারা ভেবেছিল আর কোনো ফিতনা হবে না, এজন্য তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল।'[১৫]

তারা ধরে নিয়েছিল তাদের আর পরীক্ষা করা হবে না। অর্থাৎ, তারা সতর্ক ছিল না। ফলে অন্ধ ও বধির হয়ে রইল।

মোটকথা, ভবিষ্যতে সংশয় থেকে বেঁচে থাকতে আপনাকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহকে ভয় করুন। সতর্ক হোন আপনার ঈমান নিয়ে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবেন না আজ আপনি ভালো মুসলিম, সালাত পড়ছেন, সিয়াম রাখছেন, মুমিনদের মতো

---

[১৫] সূরা আল-মাইদা, ৫ : ৭১

পোশাক পরছেন, ভবিষ্যতেও এরূপ থাকতে পারবেন। না, এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। আমাদের যে-কারও পরিবর্তন ঘটতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

এজন্য ইবনু আবী মুলাইকা ﷬ বলেন,

أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه

'আমি নবি ﷺ-এর অন্তত তিরিশ জন সাহাবির সাক্ষাৎ পেয়েছি, যাদের প্রত্যেকে নিজেদের ব্যাপারে নিফাকের ভয় করতেন।'[১৬]

সর্বশেষ আপনি কবে নিফাকি থেকে নিরাপত্তা চেয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন? কিংবা শিরক থেকে? একুশ শতকের কোনো ভ্রান্ত মতবাদ থেকে?

২) কান দেবেন না

সংশয়পূর্ণ কোনো বিষয়ে কান দেবেন না। সেসব আলোচনায় বসবেন না। তাদের ব্লগ, বইপত্র ঘাটতে যাবেন না। হতে পারে এগুলো আপনার ঈমানি ভিত নাড়িয়ে দেবে। কাজেই দূরে থাকুন।

শুবুহাত শক্তিশালী আর দ্বীন ইসলাম দুর্বল, ব্যাপারটি এমন নয়। বরং আমাদের অন্তরই দুর্বল। আমাদের পূর্বসূরিগণ সংশয়ের ব্যাপারে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিই রাখতেন।

ইবনু তাউস ﷬ আমাদের পূর্বসূরিদের একজন। তাঁর সময়কার কথা। একদিন সালিহ নামক এক লোক মজলিশে প্রবেশ করল এবং বিভ্রান্তদের মতো তাকদীর নিয়ে কথা বলতে লাগল। সাথে সাথে ইবনু তাউস ﷬ কানে আঙুল দিলেন এবং ছেলেকে বললেন,

أدخل أصابعك في أذنيك واشدد، فلا تسمع من قوله شيئاً، فإن القلب ضعيف

'কানে আঙুল দাও! শক্ত করে চেপে ধরো! ওর কোনো কথাই শুনো না। মানুষের অন্তর বড়োই দুর্বল।'[১৭]

ইমাম যাহাবি ﷬ এই ঘটনার ওপর চমৎকার একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন,

أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة

---

[১৬] যাহাবি, তারীখুল ইসলাম, ৭/৪০২

[১৭] আবদুর রাজ্জাক, আল-মুসান্নাফ, ২০০৯৯

> 'পূর্বসূরি ইমামগণের ভিতর অধিকাংশ ইমামই এ ব্যাপারে ভয় করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন অন্তর দুর্বল, আর শুবুহাত বা সংশয় ধ্বংসাত্মক।'[১৮]

অতএব নিজেকে এর সাথে জড়াবেন না। আপনার ঈমানের ওপর সংশয় আঘাত হানতে পারে। হতে পারে আপনি সংশয়পূর্ণ একটি কথা শুনে ফেলেছেন। আর এটি আপনার অন্তরে গেঁথে বসেছে। এমনভাবে বসেছে যে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত সে আর বেরই হলো না।

কে এমনটা চায়? কে এই চড়া মূল্য দিতে প্রস্তুত?

এর প্রমাণ আমরা পাই আরেকটি হাদীস থেকে। কিয়ামাতের পূর্বে সবচেয়ে বড়ো একটি শুবুহাত বা সংশয় প্রকাশ পাবে। তার নাম, 'মাসীহ আদ-দাজ্জাল'। সবচেয়ে ভয়ানক সংশয় নিয়ে সে উপস্থিত হবে। এক্ষেত্রে আমাদের নবিজি ﷺ এর নসিহত ছিল,

مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ ، فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ

> 'যে-কেউ দাজ্জালের (আগমনের) ব্যাপারে শুনবে, সে যেন তার থেকে দূরে থাকে। কারণ, আল্লাহর কসম, কিছু মানুষ এই বিশ্বাস নিয়ে তার সামনে যাবে যে, সে একজন মুমিন (তাই দাজ্জাল তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না)। অথচ (দেখা যাবে দাজ্জাল) যে সংশয় নিয়ে এসেছে, তার অনুসারী হয়ে যাবে।'[১৯]

নবিজি দাজ্জালকে দেখে আসতে বলেননি। তার থেকে কোনো অর্ডার বা সেলফি নিতে বলেননি। বরং তার থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। কেন? কারণ, সে অনেক সংশয় ছড়িয়ে দেবে। সে নিজেকে আল্লাহ দাবি করবে, আর অনেক দুর্বল মুমিন তা বিশ্বাস করবে। কী ভয়ঙ্কর!

অর্থাৎ সংশয়পূর্ণ বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে। নিজেকে শক্তিশালী ঈমানদার মনে করে ঈমানকে পরীক্ষায় ফেলা যাবে না।

৩) বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হোন

মাঝে মাঝে একটি ভালোসঙ্গ আমাদের কয়েক বছর এগিয়ে দেয়। আবার একটি খারাপ সঙ্গ আমাদের রাতারাতি পাল্টে দেয়। আপনি হয়তো ভাবছেন—আপনার ঈমান বেশ

[১৮] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/২৬১
[১৯] আবু দাউদ : ৪৩১৯; সহীহ

পাকা—এরপর খারাপ লোকদের মজলিসে বসলেন। পরক্ষণেই আবিষ্কার করলেন আপনার ঈমানের দালান ধসে পড়েছে।

আমরা সঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হই। শুধু মানুষের সঙ্গই নয়, আমরা আবহাওয়া দ্বারাও প্রভাবিত হই। মেঘ সরে সূর্য দেখা দিলে আমরা আনন্দ অনুভব করি, জরুরি কাজের সময় বৃষ্টি নামলে বিরক্ত হই। নানান আবহাওয়ায় নানান অনুভূতি বিরাজ করে আমাদের মনোজগতে। এমনকি আমরা জমিন দ্বারাও প্রভাবিত হই! উঁচু নিচু হলে এক রকম অনুভূতি, সমতল হলে আরেক রকম।

প্রাচীন সমাজবিজ্ঞানী ইবনু খালদুন আরও বিস্ময়কর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা পশু-পাখির দ্বারাও প্রভাবিত হই। উদাহরণস্বরূপ উট পালনকারী ব্যক্তি আর ভেড়া পালনকারীর ব্যক্তি—দুজন দুই রকম। তাদের স্বভাব-চরিত্রের মাঝে পার্থক্য থাকে।'

অতএব মানুষ একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এজন্য আমাদের নবিজি ﷺ বলেন,

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

> 'ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের ওপর থাকে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই যেন খেয়াল করে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব গড়ছে।'[২০]

অতীতে ইমরান ইবনু হিত্তান নামক এক নেককার বুজুর্গ ছিল। কিন্তু তার এই পরহেজগারিতা বিয়ের আগ পর্যন্ত টিকল। সে তার এক চাচাতো বোনকে বিয়ে করতে চাইল, যে কিনা খারেজি মতাদর্শের অনুসারী। খারেজিরা তাকফীর এবং হত্যার মতো বিষয়গুলোতে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। লোকেরা ইমরানকে সাবধান করল সে খারেজি। কিন্তু ইমরান তাদের অভয় দিয়ে বলল, 'চিন্তা কোরো না। ইন শা আল্লাহ আমি তাকে পাল্টে ফেলব।' সে তাকে বিয়ে করে নিল। তারপর যা হবার তা-ই হলো। মেয়েটিই তাকে পাল্টে ফেলল। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে ইমরান খারেজিদের একজন প্রভাবশালী নেতায় পরিণত হলো!

বাস্তবতা অত্যন্ত রূঢ়। আমাদের সঙ্গ প্রয়োজন, আমাদের পরিবার প্রয়োজন, বন্ধু-বান্ধব প্রয়োজন—অস্বীকার করছি না। কারণ, আমরা সামাজিক জীব। আমরা ভালোবাসার বন্ধনে জুড়ে থাকি। তবে কখনও কখনও দুটো জিনিস মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ায়; সত্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, আর সম্পর্ক রক্ষার প্রতি আকাঙ্ক্ষা। তারা পরস্পর একে অপরের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ায়। আর আমার অভিজ্ঞতা বলে, দশভাগের নয়ভাগ মানুষই এসব

---

[২০] আবূ দাউদ, ৪৮৩৩; সহীহ।

ক্ষেত্রে সত্যের ওপর সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে বসে।

মানুষের মস্তিষ্ক এভাবেই কাজ করে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সাইকোলজিস্ট স্টিভেন পিনকার এমনটাই বলেছেন। তিনি বলেন,

> 'the brain sometimes pushes a person to accept a belief even though it may be factually incorrect but it is socially correct.'

> 'মস্তিষ্ক মাঝে মধ্যে ব্যক্তিকে এমন কিছুতে বিশ্বাস করতে জোর প্রদান করে, যা বাস্তবিক অর্থে ভুল, কিন্তু সমাজে সঠিক বলে বিবেচিত।'

আপনি জানেন এটা ভুল। হতে পারে এটা একটা শুবুহাত, ভ্রান্ত বিষয়। হয়তো গুটি কয়েক মানুষ একে দ্বীনের অংশ বলেছে। কিন্তু আপনি যে দলের সাথে চলছেন, যাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ছেন, তাদের বিশ্বাসের দ্বারা আপনি প্রভাবিত হয়ে গেলেন। ফলে একসময় যাকে ভুল জানতেন, তাকে এখন সঠিক ভাবছেন।

কাজেই বন্ধুত্বের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। যেভাবে আপনি আপনার শরীরের যত্ন নিচ্ছেন, ঠিক সেভাবেই আপনার ঈমানের যত্ন নিন।

৪) দ্বীন নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনা করুন

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বারবার একটি কথা বলছে আর তা হলো, আমাদের দেহের রোগ-প্রতিরোধ-ব্যবস্থা প্রতিটি মুহূর্তে ক্যান্সার কোষ ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত। আমাদের শরীরের এই ক্ষমতা আছে। তবে বিজ্ঞানীরা বলেছে, আমরা যখন সুস্থ খাদ্যাভাস ছেড়ে দিই, অস্বাস্থ্যকর খাবার খাই, ব্যায়াম করি না, দৌড়াই না, ঘুমের অভ্যাসের ব্যাপারে সচেতন হই না, তখন আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে। দুর্বল হয়ে যায় সে। ফলে ক্যান্সার কোষগুলো প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং ছড়িয়ে পড়ে।

একই কথা ইসলামের ক্ষেত্রেও খাটে। শুবুহাত বা সংশয় তখনই আমাদের অন্তরে জায়গা করে নিতে পারে, যখন আমরা ইলম অর্জন ছেড়ে দিই। অথবা যে পরিমাণ মনোযোগ দেবার কথা ছিল সে পরিমাণ দিই না। ইলম ও আমলের ব্যাপারে নিজের সর্বোচ্চটা প্রয়োগ করি না। ফলে সংশয় আমাদের ঈমানের পথচলায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে আমরা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। অথচ ঠিক একই সময় একজন দ্বীন শিক্ষার্থীর কাছে এই সংশয় হাস্যকর ঠেকে! তারা বলে, 'আমি এই সংশয় ভেদ করে সত্য দেখতে পাচ্ছি।'

পার্থক্য কোথায়? ইলম বা জ্ঞানই হলো মূল পার্থক্য। অতএব দ্বীন নিয়ে কার্যকরী সিলেবাস তৈরি করুন, এরপর পড়াশোনায় নেমে পড়ুন। সংশয়ের জালে আটকে যাবার আগেই শুরু করুন। আজ থেকেই।

শুবুহাত বা সংশয়ে আক্রান্ত হলে করণীয় :

এবার আমরা এমন চারটি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব তাদের জন্য, যারা এই মুহূর্তে সংশয়ে ভুগছেন। হতে পারে আপনি নিজেই শুবুহাতে বা সংশয়ে আক্রান্ত অথবা আপনার চেনা পরিচিত কেউ। যদি তা-ও না হয়, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে হলেও এই চারটি পয়েন্ট মগজে গেঁথে ফেলুন :

১) মন্দ চিন্তাকে হটিয়ে বিদায় করুন

খারাপ চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবেন না। সন্দেহযুক্ত কোনো চিন্তা আসলেই সেটা শুবুহাত নয়, বরং শুরুর দিকে সেটা থাকে স্রেফ ওয়াসওয়াসা, শয়তানের কুমন্ত্রণা। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু এই চিন্তাকে মনের ভেতর লালন করা শুরু করলেই তা সংশয়ে রূপ নিতে শুরু করে। আর তখনই বিপত্তি বাঁধে। এজন্য ওয়াসওয়াসাকে পাত্তা দেওয়া যাবে না।

আমাদের নবিজি ﷺ বলেছেন,

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولَ : مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا ؟ حَتَّى يَقُولَ لَهُ : مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟
فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ

‘শয়তান তোমাদের কারও কারও (চিন্তায়) এসে বলে, “এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে?” এভাবে একপর্যায়ে সে বলে, “তোমার রবকে তা হলে কে সৃষ্টি করেছে?” যখন এমন অবস্থা হলে ব্যক্তি যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলে।’[২১]

মন্দ চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। মনে জায়গা দেবেন না। আল্লাহর কাছে পানাহ চান। বলুন, ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতনির রজীম।’ মন্দ চিন্তা দৃঢ়-বিশ্বাসে পরিণত হবার আগেই তার রশি কেটে দিন।

একটি মজার ঘটনা বলি। একবার আমাদের এখানকার শারীআ-কাউন্সিলে এক ভাই এসেছিল তার স্ত্রীকে নিয়ে। সে বলল, আমরা বিয়ে নবায়ন করতে চাই। আমি বললাম, কেন ভাই? কী হয়েছে?

আমি দ্বীন ত্যাগ করে ফেলেছি।

— এমনটি মনে হচ্ছে কেন আপনার?

সে জানাল, একদিনকার কথা। আমি তখন বাসায় ছিলাম। হঠাৎ আমার মাথায় এমন

---

[২১] মুসলিম : ২২২

কিছু ভাবনা জন্ম নিল, যা কুফরের শামিল। অতএব আমি দ্বীন থেকে বেরিয়ে গেছি। আমি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে আমার স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাই।

— না ভাই, বিষয়টি এত সহজ নয়। এটা তো স্রেফ শয়তানের ওয়াসওয়াসা ছিল। আপনার এই ভয় প্রমাণ করে আপনার ঈমান এখনও মজবুত আছে।

এই ধরণের ওয়াসওয়াসা সাহাবিদের মনেও এসেছিল।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلُوهُ : إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ، قَالَ : وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদল সাহাবি নবিজির কাছে এসে বললেন, 'আমরা নিজেদের (মনের) ভিতর এমন কিছু পাই, যা আমাদের কারও কারও কাছে অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক ঠেকে।' নবিজি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা সত্যিই এমন কিছু পাও?' তারা বলল, 'জি, হ্যাঁ।' তিনি ﷺ বলেন, 'এটাই খাঁটি ঈমান।'[২২]

এই যে ঈমানের ব্যাপারে ভয়, এটাই খাঁটি ঈমানের পরিচয়। কারণ, এগুলো শুবুহাত নয়, স্রেফ ওয়াসওয়াসা। অতএব ওয়াসওয়াসাকে প্রাধান্য দেবেন না। মাথায় এলে দুশ্চিন্তাও করবেন না।

২) জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করুন

মাঝে মাঝে আমি খুব অবাক হই সেসব ভাই-বোনদের দেখলে, যারা সামান্য সংশয়ের মুখে ভেঙে পড়ে। তারা বলতে থাকে—"আমি শুধু একটি লেখা পড়েছি, তাতেই আমার ঈমান উবে গেল! একটু কথাবার্তা শোনার দ্বারাই অন্তরে সংশয় গেঁড়ে বসল! আমি তো শেষ, আমার মুক্তি নেই।'

আপনি কেন ভেঙে পড়ছেন? কেন বিষয়টাকে এত বাড়াবাড়ির স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন? আল্লাহ আপনার আমার কাছে এমনটা চান না। শান্ত হয়ে বসুন। নিঃশ্বাস ছাড়ুন। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনার সামনে কী এসেছে? এটা কি অকাট্য কিছু? বাহ্যিকভাবে একদম স্বচ্ছ? ভাবুন। আপনার অন্তরকে স্পঞ্জের মতো বানাবেন না, সামনে যা পায়, তা-ই চুষে নেয়। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করুন। প্রশ্ন করতে শিখুন। যে বিষয়টা আপনার

---

[২২] মুসলিম : ২১৯

অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে, তার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলুন। কিছু একটা পেলেই তাকে এত বেশি গুরুত্ব দেবেন না।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'আমি একবার আমার শাইখ ইবনু তাইমিয়্যাকে অনেক প্রশ্ন করছিলাম। শাইখ আমাকে বললেন, "শুনো, তোমার অন্তরকে স্পঞ্জ বানিয়ে ফেলো না, যার সামনে সংশয়পূর্ণ যা-ই আসে, তা-ই সে শুষে নেয়। বরং তোমার অন্তরকে কঠিন ও স্বচ্ছ কাচের মতো বানাও। সংশয় যেন তাকে অতিক্রম করতে গেলে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়। কাচটি এতই স্বচ্ছ যে, সংশয়ে ভিতরেও সে সত্যকে দেখতে পারে।"'

পরবর্তীকালে ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'আমার গোটা জীবনে আমার শাইখের এই নসিহতের চেয়ে উপকারী আর কিছুই পাইনি, যা আমাকে সংশয়পূর্ণ চিন্তা থেকে বেঁচে থাকতে এতটা কাজে দিয়েছে।'

সুতরাং দ্বিতীয় মূলনীতি হলো, সংশয় সৃষ্টিকারী যে-কোনো কথা বা লেখাকে প্রশ্ন করুন। সামনে উপস্থিত যে-কোনো কিছুকেই সত্য বলে ধরে নেবেন না।

৩) জ্ঞানী ব্যক্তি খুঁজে বের করুন

আপনি যে বিষয়ে সংশয়ে ভুগছেন, সে বিষয়ে জ্ঞানী, দক্ষ ব্যক্তির শরণাপন্ন হোন। জ্ঞানী বলতে আমি আপনার এলাকার মসজিদের ইমামের কথা বোঝাচ্ছি না। আমাদের ইমাম, মাশায়েখের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা রেখেই বলছি—মাঝে মাঝে ইমামের যোগ্যতা হয়ে দাঁড়ায় স্রেফ সুমধুর কণ্ঠ। এদিকে আপনি বুকভরা আশা নিয়ে তার কাছে যাচ্ছেন, ভাবছেন আপনার সব প্রশ্নের উত্তর তার কাছে আছে। অতঃপর আপনি হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। দুবার, তিনবার, কোনো বারই সঠিক উত্তর পেলেন না। ফলে আপনি ভাবতে লাগলেন, হয়তো এর কোনো উত্তরই নেই। বিষয়টি এমন নয়। এই ক্ষেত্রে একটি নীতি মাথায় রাখবেন,

عدم العلم ليس دليلا على العدم

'কোনো বিষয়ে কারও জ্ঞান না থাকা মানে এই নয় যে ওই বিষয়ে জ্ঞানই নেই।'

আলি হাম্মুদা জানে না তার মানে এই নয় যে, আপনার প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। আপনার সমস্যার জন্য দক্ষ কাউকে খুঁজে বের করুন। কুরআনও আপনাকে তা-ই করতে বলে।

আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

'অথচ তারা যদি এটা রাসূল ও তাদের দায়িত্বশীল লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, তা হলে তা এমন লোকদের দৃষ্টিগোচর হয়, যারা তাদের মধ্যে কথা বলার যোগ্যতা রাখে এবং তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।'[২৩]

বিজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হোন। কারণ, সে আপনার সামনে সংশয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারবে। খণ্ডন করতে পারবে। যা আমি আপনি একাকী করতে পারব না।

৪) ঈমান রক্ষায় দুআ

আমাদের ভিতর যদি জরিপ চালানো হয় কে কে নেককার জীবনসঙ্গিনীর জন্য দুআ করেছে, তা হলে আমিসহ হয়তো সবার নামই চলে আসবে। আলহামদু লিল্লাহ। সুস্থ জীবন, সুদমুক্ত বাড়ি নির্মাণ, ভালো গাড়ি, সন্তানের শিক্ষাখাতে খরচ কমিয়ে আনা, এগুলো আমরা সবাই চাই। এ জন্য দুআও করি। দুআর দরজা তো সর্বদাই উন্মুক্ত। এগুলো অবশ্যই চাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আছে। তা হলো, আমাদের ঈমান। সর্বশেষ আমরা কবে ঈমান রক্ষার জন্য দুআ করেছিলাম? মনে পড়ে কি সর্বশেষ আপনি কবে হাত তুলে ঈমানের নিরাপত্তা চেয়েছেন? ইবরাহীম ﷺ-এর এই দুআটি কি কখনও করেছিলেন?

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ

'...এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন'[২৪]

ইবরাহীম ﷺ-এর মতো একজন নবি এই দুআ করেছেন! হ্যাঁ, তিনি নিজের ব্যাপারে এই ভয় করতেন। সেখানে আমরা কোথায়!

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ। 'আমাদের সরল পথ দেখান' অন্তরের অন্তস্তল থেকে এই দুআটি করুন। এরপর দেখুন, আপনার সালাত কীভাবে পাল্টে যায়। সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

একদিন আমাদের মা আয়িশা ﷺ দেখলেন নবিজি ﷺ তাহাজ্জুদ পড়ছেন। তিনি তাঁকে

[২৩] সূরা নিসা, ৪ : ৮৩
[২৪] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩৫

নিম্নোক্ত দুআটি করতে শুনলেন। মুখস্থ করে ফেলুন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اِهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'আল্লাহ—তুমি জিবরাঈল, মিকাঈল এবং ইসরাফীলের রব। তুমিই আসমান জমিনের স্রষ্টা। অদৃশ্য এবং দৃশ্য সম্পর্ক তুমিই অবগত। তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে মীমাংসা করো, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে। যে সত্য নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, তোমার ইচ্ছায় ওই বিষয়ে আমাকে সঠিক পথ দেখাও। নিশ্চয়ই তুমি যাকে ইচ্ছা তাকেই সঠিক পথে পরিচালিত করো।'[২৫]

জিবরাঈল ﷺ-এর মাধ্যমে, ওহির মাধ্যমে সরাসরি রবের সাথে যে মানুষটির যোগাযোগ ছিল, সে কিনা দুআ করছে, 'আমাকে হক পথ দেখাও, যে বিষয়ে মতভেদ করা হয়!' সেখানে আমরা কোথায়? কাজেই আপনিও এই দুআ করুন। এরপর দেখুন আপনার ঈমানি সুস্থতা কীভাবে ফিরে আসে।

পরিশেষে প্রিয় পাঠক, জীবনের লক্ষ্য স্থির করুন। খুঁজে বের করুন আপনার দক্ষতা কোথায়। ভালো কোনো কাজে যুক্ত হয়ে যান। এমন কাজ যা কিয়ামাতের দিন আপনার জন্য অকল্পনীয় ফলাফল নিয়ে আসবে, মৃত্যুর পরেও যে কাজের সুমিষ্ট ফল আপনি ভোগ করতে থাকবেন।

হয়তো ভাবছেন, সংশয়ের সাথে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের কী সম্পর্ক? শেষে এসে এটা বলার হেতু কী?

সত্যি বলতে কী, অধিকাংশ সময় আমাদের সংশয়ের মূলে একটাই কারণ থাকে, অত্যধিক অবসর সময়। এ ছাড়া আর কিছুই না। আমরা খারাপ মানুষ, অজ্ঞ-জাহিল, এজন্য নয়। বরং এর চেয়েও সাধারণ বিষয় দায়ী; আমাদের অবসর সময়। আমরা অনেকেই অত্যধিক ফ্রি সময় কাটাই। কর্মহীন এই সময়গুলো শয়তানের জন্য মোক্ষম সুযোগ। খালি ময়দান পেয়ে সে তাতে সংশয়ের দানা ছুড়ে মারে। উদ্ভট সব চিন্তা মাথায় ঢুকিয়ে দেয়।

সংশয় নিরসন করার জন্য একজন বিজ্ঞ আলিম আছেন আমার পরিচিত। শায়খ আহমাদ। তিনি সম্প্রতি একটি চমৎকার ঘটনা বলেছেন আমাকে।

এক বোন ছিল, আমার কাছে প্রায়ই আসতেন বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে। প্রশ্নগুলোর সবকটাই

[২৫] মুসলিম, ৭৭০

সংশয়-বিষয়ক থাকত। আমি উত্তর দিতে থাকলাম। কিন্তু একটি প্রশ্ন শেষ হতে-না-হতেই সে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করত। যেন সংশয়ের ঝড় বইছে তার ভিতর! আমি বুঝতে পারছিলাম না, কী করব। একদিন মনে হলো, আমি সম্ভবত সমস্যাটা ধরতে পেরেছি। তাকে ডেকে বললাম, "বোন, আমার কাছে কিছু লেকচার আছে। আমি সেগুলোর লিখিত প্রতিলিপি (transcript) করাতে চাচ্ছি। আপনার কি সময় হবে এই কাজটি নেবার? তা হলে আমার উপকার হতো।" সে বলল, "অবশ্যই, আমি পারব ইন শা আল্লাহ।" আমি তাকে ফাইলগুলো দিলাম। সে প্রতিলিপি লেখা শুরু করল। কিছু দিন যেতেই খেয়াল করলাম, প্রশ্ন আসা বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর আর কোনো দিন সে আমার কাছে সংশয়পূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আসেনি।'

মাত্রাতিরিক্ত অবসর সময় অধিকাংশ রোগের মূল। অতএব আপনি আখিরাতের জন্য কাজে লেগে পড়ুন। জীবনের একটি বড়ো অংশ এতে ঢেলে দিন। আজকে থেকেই। এটা স্রেফ আপনার সংশয় থেকেই রক্ষা করবে না, পরকালেও আপনাকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করবে ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাকে আপনাকে ঈমানের স্বাদ উপভোগ করার তাওফীক দেন, আমাদের ইয়াকীনের চাদরে মুড়িয়ে দেন। এবং আমাদের বাবা-মা, সন্তান-সন্ততিদের মাফ করে দেন। আমীন!

শুদ্ধ জীবন শুদ্ধ মনন

ইবরাহীম ﷺ-এর একটি বিখ্যাত দুআ আছে :

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

> "..(ও আল্লাহ) পুনরুত্থান-দিবসে আমাকে অপমানিত কোরো না। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। সে ব্যতীত, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তর (কলবুন সালীম) নিয়ে।"[২৬]

আজ যদি আমাদেরকে জানানো হয়, 'আপনার হার্টের কিছু অংশ ব্লক হয়ে গেছে।' তা হলে আমরা অনেকেই এর চিকিৎসায় অর্জিত সকল অর্থসম্পদ ব্যয় করতেও কুণ্ঠাবোধ করব না। জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড এর পেছনে দেব, তবুও এটা নিশ্চিত হতে হবে, আমার হার্ট সুস্থ। আমরা জানি, ব্লক নিয়ে নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকা যায় না। জীবন এভাবে চলতে পারে না।

সত্যিকার অর্থে অন্তরের মৃত্যু কাকে বলে—ইবরাহীম ﷺ আমাদের জন্য সেই শিক্ষা রেখে গেছেন। আসলে অন্তরের মৃত্যু তখন ঘটে না, যখন এর স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা কোলেস্টরল জমে ব্লক হয়ে যায়; বরং অন্তরের প্রকৃত মৃত্যু তখনই ঘটে, যখন এর ভিতরের ঈমান মরে যায়, বিশ্বাসটুকু নষ্ট হয়ে যায়। যখন আপনি ইসলামের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে শুরু করবেন, তখনই অন্তর মৃত্যুর মুখে পড়ে।

ইবরাহীম ﷺ আমাদের বলছেন, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা সুস্থ অন্তর ছাড়া কিছুই গ্রহণ করবেন না। খুবই ভয়াবহ একটি আয়াত ভাই ও বোনেরা।

---

[২৬] সূরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৮৭-৮৯

যে নিষ্পাপ অন্তর নিয়ে আমরা প্রত্যেকে জন্মিয়েছি, আল্লাহ সেই অন্তর ধারস্বরূপ আমাদের দিয়েছেন। এই অন্তর আমাদের জন্য আমানত। তেমনি আমাদের কাছে আশা করা হয়েছে, দিন শেষে এই আমানতকে সেই অবস্থাতেই ফিরিয়ে দেব, যে অবস্থায় প্রথমে পেয়েছিলাম। নয়তো আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না। মোটেও গ্রহণ করবেন না।

প্রশ্ন হচ্ছে, কলবুন সালীম বা সুস্থ অন্তর কী? সেই অন্তরের বৈশিষ্ট্য কী, যা ব্যতীত আল্লাহ তাআলা কোনোকিছুই গ্রহণ করবেন না?

মুজাহিদ ﷺ বলেন,

لا شك فيه.

"কলবুন সালীম হলো, যে অন্তরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"[২৭]

কাতাদা ﷺ বলেন,

سليم من الشرك

"কলবুন সালীম হচ্ছে, যে অন্তর সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত।"[২৮]

অর্থাৎ প্রকৃত তাওহীদে বিশ্বাসী।

দাহহাক ﷺ বলেন,

هو الخالص

"যে অন্তর একনিষ্ঠ।"[২৯]

যে অন্তরে লোকদেখানো স্বভাব নেই। শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।

আবূ উসমান ﷺ বলেন,

القلب السليم هو القلب الخالي من البدعة المطمئن إلى السنة

"কলবুন সালীম হলো, যে অন্তর বিদআত থেকে মুক্ত এবং সুন্নাহ নিয়ে পরিতৃপ্ত।"[৩০]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ ওপরের সবগুলো মণিমুক্তা একত্র করে চমৎকার একটি বাক্য দাঁড়

---

[২৭] তাবারি, আত-তাফসীর, ১৭/৫৯৬
[২৮] প্রাগুক্ত
[২৯] প্রাগুক্ত
[৩০] কুরতুবি, আত-তাফসীর, ১৩/১১৪

করিয়েছেন :

ولا يتم له سلامته مطلقًا؛ حتى يسلم من خمسة أشياء:

من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص

'একজন মুসলিমের অন্তর ততক্ষণ পর্যন্ত কলবুন সালীম হতে পারবে না, যতক্ষণ না ৫টি রোগ থেকে মুক্ত হচ্ছে :

১) শিরক ও কুফর থেকে মুক্ত হওয়া, যা তাওহীদ বিনষ্ট করে।

২) বিদআত থেকে মুক্ত হওয়া, যা সুন্নাহ বিনষ্ট করে।

৩) (হারাম) খায়েশ থেকে মুক্ত হওয়া, যা (আল্লাহ ও রাসূলের) নির্দেশের বিরুদ্ধে যায়।

৪) গাফলতি থেকে মুক্ত হওয়া, যা আল্লাহর স্মরণ নষ্ট করে দেয়।

৫) প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হওয়া, যা ঈমানী দৃঢ়তা এবং ইখলাস নষ্ট করে দেয়।'[৩১]

এগুলো মনে রাখতে কষ্ট হলে শুধু এই বাক্য মনে রাখুন, 'কলবুন সালীম হচ্ছে, যে অন্তর পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।'

কুফর-শিরকের কোনো স্থান নেই এতে। বিদআতী কর্মের প্রতি আগ্রহ নেই। সংশয়বাদীদের কিংবা মুনাফিকদের সংশয়মূলক কথা-বার্তায় এই অন্তর মোটেও প্রভাবিত হয় না। বিভিন্ন প্রকার তন্ত্রমন্ত্র, আদর্শ, কিংবা পূর্ব-পশ্চিমের কোনো দর্শনে পরিচালিত হয় না। কে কী ভাবল, এসবের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করে না, এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে কেবল আল্লাহর মনোযোগ চায়, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। এমন অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি অপর মুসলিমের সাথে তিন দিনের বেশি বয়কট করে থাকতে পারে না। কারণ, তার অন্তর পরিশুদ্ধ, পঙ্কিলতামুক্ত। এতে নেই মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ, কারও প্রতি আক্রোশ। কারও কল্যাণ দেখলে সে বিচলিত হয় না, হিংসা করে না। সেই কল্যাণ হতে পারে একজন সুন্দরী স্ত্রী, নতুন মডেলের গাড়ি, কিংবা চোখধাঁধানো বাড়ি... যাই হোক। এসব দেখে বলে, 'হে আমার রব, এগুলো যদি তার জন্য কল্যাণকর হয়, তা হলে আরও বাড়িয়ে দিন।'

আর কারও সাথে খারাপ কিছু হতে দেখলে সে আত্মতুষ্টিতে ভোগে না। বরং তাদের জন্য দুআ করে—'হে আমার রব, তাদের হিদায়াত দিন। তাদের কল্যাণ করুন। তাদের

[৩১] ইবনুল কাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফি, ১২১

সুস্বাস্থ্য দিন।'

এটাই হলো প্রশান্ত আত্মার নমুনা। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সমগ্র কুরআনে কলবুন সালীমের আলোচনা মাত্র দুবার এসেছে। সর্বপ্রথম এসেছে ইবরাহীম ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে। দ্বিতীয়বারও এসেছে ইবরাহীম ﷺ-কেই উদ্দেশ্য করে।

প্রথমটি আমাদের আলোচ্য আয়াতগুলো। অর্থাৎ সূরা আশ-শুআরা, এর ৮৭ থেকে ৮৯ আয়াত। আর দ্বিতীয়টি সূরা সফফাতের ৮৩-৮৪ নং আয়াতগুলো :

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾

"আর নিশ্চয়ই ইবরাহীম তার দ্বীনের অনুসারীদের একজন। (স্মরণ করো) যখন সে তার রবের নিকট বিশুদ্ধ অন্তর (কলবুন সালীম) নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।"

অন্তরকে মোটেও সাপবিচ্ছুর ঘর বানাবেন না ভাই-বোনেরা। হিংসাবশত কাউকে ছোবল মারা, ফাঁসিয়ে দেওয়া, কীভাবে আমি তার চেয়ে ওপরে উঠব—এই ধরণের মানসিকতা লালন করে অন্তরটাকে কীটপতঙ্গের ঘর বানাবেন না। এমন অগ্নিকুণ্ড অন্তরে প্রজ্জ্বলন করবেন না, যা আপনাকেই পুড়িয়ে মারবে, আপনারই বিপদ ডেকে আনবে। দিনশেষে আপনি নিজেই এর মধ্যে পড়ে যাবেন, এসব করে শুধু নিজেরই ক্ষতি করবেন।

তাই প্রতিদিন ঘুমোতে যাবার পূর্বে চিন্তা করুন, আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্কের বাঁধন নিয়ে। তারপর চিন্তা করুন, মানুষদের সাথে আপনি কেমন। চিন্তা করুন, কৃত-পাপগুলো নিয়ে, শিরক নিয়ে, যা আপনার তাওহীদকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। বিদআত নিয়ে, যা আপনার কর্মপন্থায় ঢুকে যাচ্ছে। ভাবুন আপনার প্রবৃত্তির খায়েশ নিয়ে, যা আপনি সেদিন বাস্তবায়ন করেছেন। ভাবুন, আর আল্লাহর কাছে মাফ চান। ইস্তিগফার করুন, আন্তরিকভাবে তাওবা করুন।

এরপর মানুষদের দিকে মনোনিবেশ করুন। তাদের কথা ভাবুন, যারা আপনার দ্বারা কষ্ট পেয়েছে এবং যারা আপনাকে কষ্ট দিয়েছে। যারা আপনার দ্বারা কষ্ট পেয়েছে, তাদের কাছে মাফ চাওয়ার মনস্থির করুন। আর যারা আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের সবাইকে একে একে মাফ করে দিন। নাম ধরে ধরে তাদের জন্য দুআ করুন।

আর এসব করবেন এই আশা নিয়ে, যেন আল্লাহ আপনাকে এমন একটি অন্তর দান করেন, যা হবে পাপ-পঙ্কিলতা-মুক্ত, পবিত্র, একদম স্বচ্ছ। কলবুন সালীম।

ক্যালেন্ডারের পাতায় ২১১৯ সাল

আজ থেকে এক শ বছর পর। লেখাটি যারা পড়ছেন, আমাদের প্রত্যেকের দেহ তখন মাটির নিচে থাকবে। অস্তিত্ব তখন রূহের জগতে। দেখছি আমাদের নিজেদের তাকদীর, জান্নাতী না জাহান্নামী।

জমিনে-ফেলে-আসা আমাদের সুন্দর বাড়িটি হয়তো অন্যের দখলে চলে গেছে। পছন্দের কাপড়গুলো এখন অন্যরা পরছে, শখের গাড়িটি হয়তো অন্য কেউ চালাচ্ছে। আর আমাদের? খুব কম জনই স্মরণে রেখেছে। কেউ কেউ হয়তো ভুলেই গেছে। আচ্ছা, ব্যস্ততার এই জীবনে আপনার দাদার দাদাকে কতবার স্মরণ করেছেন? আপনার দাদির দাদিকে কখনও কি মনে পড়েছে?

প্রজন্মের-পর-প্রজন্ম পেরিয়ে আমরা এই জীবন লাভ করেছি। তেমনিভাবে নতুন প্রজন্মের ভিড়ে আমরাও একদিন হারিয়ে যাব।

এভাবে অনেক প্রজন্ম আসছে আর যাচ্ছে। কিন্তু দুনিয়াকে বিদায় জানানোর সময় খুব কম জনই ফেলে-যাওয়া জীবনটা একটু ফিরে দেখার সুযোগ পেয়েছে। বাস্তবতা হলো, এই জীবনটা আমাদের কল্পনার চেয়েও সংক্ষিপ্ত।

২১১৯ সালে কবরে শুয়ে আমরা সবাই এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারব, সত্যিই দুনিয়াটা কতই-না তুচ্ছ ছিল! একে-ঘিরে-দেখা স্বপ্নগুলো কতই-না নগণ্য ছিল!

২১১৯ সালে আমরা সকলেই চাইব, 'ইশ, যদি জীবনটা মহৎ কিছুতে উৎসর্গ করতে পারতাম! ইসলামের জন্যে! নেক আমল সংগ্রহের পেছনে দিতে পারতাম! মৃত্যুর পরেও যে কাজগুলো আমাদের উপকার করে চলছে, সেগুলোর পেছনে যদি সব উৎসর্গ করতে পারতাম!'

২১১৯ সালে আমরা অনেকেই চিৎকার করে কথাগুলো বলব, কিন্তু কোনো ফল বয়ে

আনবে না এই হাহাকার : '..আমার রব, আমাকে আবার ফেরত পাঠান। যেন আমি নেক আমল করতে পারি যা আমি আগে করিনি।'[৩২]

জবাব মিলবে, 'না, এটা হবার নয়। এটা তো তার একটা কথামাত্র, যা সে বলার জন্যই বলবে। তাদের সামনে বারযাখ থাকবে উত্থান-দিবস পর্যন্ত।'[৩৩]

২১১৯ সালে আমরা অনেকেই আফসোস থেকে নিজেদের হাত কামড়াব, আর বলব, 'হায়, আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম!'[৩৪]

ভাইরে, মৃত্যুর ফেরেশতা আমাদেরকে নেককার হবার সময় দেবে না। বোনরে, সে অপেক্ষা করবে না আমাদের জন্য...

তাই আসুন না, মালাকুল মাউত আসার আগেই আমরা সংশোধন হয়ে যাই। পাপে-ভরা জীবনটাকে পাল্টে ফেলি। চিরদিনের জন্য পাল্টে ফেলি।

[৩২] সূরা আল-মু'মিনুন, ২৩ : ৯৯
[৩৩] আল-মু'মিনুন, ২৩ : ১০০
[৩৪] সূরা আল-ফাজর, ৮৯ : ২৪

রহমানের পরিচয়

রাসূল ﷺ বলেন,

لما خلق اللهُ آدمَ ونفخ فيه الروحَ ؛ عطس، فقال : الحمدُ للهِ، فحمد اللهَ بإذنِه،
فقال له ربُّه : يرحمُك اللهُ يا آدمُ !

'আল্লাহ্ তাআলা যখন আদমকে সৃষ্টি করে রূহ ফুঁকে দিলেন, তিনি হাঁচি দেন এবং বলেন, "আলহামদু লিল্লাহ।" আল্লাহর তাওফীকেই তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন। এরপর আল্লাহ্ বলেন, "ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুক) আদম।"'[৩৫]

'আর-রহমান', কুরআনের পাতায় বিশেষ স্থান পেয়েছে আল্লাহ্ তাআলার এই নাম। তাই মুসলিম-মাত্রই এই নামের প্রতি বিশেষ অনুভূতি কাজ করা উচিত। আমরা আল্লাহর ৯৯টি নাম জানি। খেয়াল করলে দেখব, প্রতিটি নাম অতীব মহান, স্ব-স্ব গুণে পরিপূর্ণ এবং মহিমান্বিত। কিন্তু الرَّحْمَٰن 'আর-রহমান' নামটি সবগুলো থেকে ভিন্ন। এর অনন্যতা এত ব্যাপক যে, সর্বোত্তম নাম 'আল্লাহ' নামের পাশাপাশি 'আর-রহমান' নামটিও বসানো যায়। এমন কিছু গুণের সমষ্টি এই নাম, যা শুধুমাত্র আল্লাহর সাথেই যায়। আর-রহমান নামের অনন্যতা এবং মহত্ত্ব বুঝতে নিচের ছয়টি উদাহরণ যথেষ্ট :

১. আর-রহমান কখনও Indefinite হয় না

ব্যাকরণ অনুযায়ী আর-রহমান নামটি কুরআনে অনির্দিষ্টরূপে—অর্থাৎ শুরুতে আলিফ-লাম ব্যতীত কখনও আসেনি। এই দিকে আল্লাহর অন্য নামগুলো নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট উভয় রূপেই পাওয়া যায়। কুরআনে দেখবেন الْعَزِيزُ (আল-আযীয), আবার আলিফ-লাম

---

[৩৫] তিরমিযি, ৩৩৬৮; সহীহ

ছাড়া শুধু عَزِيْزٌ (আযীয)—দুটোই আছে। তেমনি الْغَفُوْرُ। আল-গফূর এবং غَفُوْرٌ গফূর। ব্যতিক্রম শুধু الله এবং الرَّحْمٰنُ। নাম দুটোতে। কুরআনের কোথাও শুধু رَحْمٰنٌ পাবেন না।

২. আর-রহমান নাম কাউকে অনুসরণ করে না

আল্লাহ ও আর রহমান নামের আগে আল্লাহ তাআলার অন্য কোনো নাম বসে না। যেমন আমরা কুরআনে الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ পাব, وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ (তোমাদের ইলাহ একজন) পাব। কিন্তু 'الرَّحِيْمُ الرَّحْمٰنُ' (আর-রহীমুর রহমান) কিংবা الْغَفُوْرُ الرَّحْمٰنُ। (আল-গফূরুর রহমান) পাব না কুরআনে। 'আল্লাহ' নামের বেলায় এটি প্রযোজ্য। আল্লাহ নামের আগে অন্যকোনো সিফাতি নাম বসে না। একইভাবে শুধুমাত্র আর-রহমান নামটিও এই মর্যাদা লাভ করেছে। আর রহমান নামের আগেও অন্যকোনো সিফাতি নাম বসে না। আল্লাহর অন্যকোনো সিফাতি নাম এই মর্যাদা লাভ করেনি।

৩. আরশের মালিক আর-রহমান

আল্লাহ তাআলা আরশে اِسْتَوٰى (আভিধানিক অর্থ 'অধিষ্ঠান') গ্রহণের আলোচনায় কুরআনে শুধু 'আল্লাহ' নামটি ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

'নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন।'[৩৬]

এখানেও ব্যতিক্রম দেখা যায় কেবল আর-রহমান নামে। আরশে সমাসীন হওয়ার কথা কুরআনের ভিন্ন এক আয়াতে এসেছে :

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

'রহমান আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন।'[৩৭]

৪. আর-রহমান, শিখিয়েছেন কুরআন

কুরআন নাযিল-সংক্রান্ত আয়াতসমূহে 'আল্লাহ' নাম এসেছে। যেমন :

اللّٰهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

---

[৩৬] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৪
[৩৭] সূরা ত্বহা, ২০ : ৫

'আল্লাহ—যিনি নাযিল করেছেন সত্য-সহকারে কিতাব।'[৩৮]

এখানেও ব্যতিক্রম; আর-রহমান নামকে কুরআন নাযিলের সাথে জুড়ে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। তিনি বলেন,

الرَّحْمٰنُ – عَلَّمَ الْقُرْآنَ

'আর-রহমান—শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।'[৩৯]

৫. আশ্রয়স্থলের আরেক নাম আর-রহমান

পানাহ বা আশ্রয় চাইতে 'আল্লাহ' নামে দুআ জপি আমরা। যেমন মূসা ﷺ বলেছিলেন,

قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

'আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই'[৪০]

কুরআনে আশ্রয় চাওয়ার আরেকটি ঘটনা এসেছে। কিন্তু সেখানে আল্লাহ নামের পরিবর্তে অন্য একটি নাম পাবেন, মারইয়াম ﷺ বলেন,

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

'আমি আর-রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার থেকে, (আল্লাহকে ভয় করো) যদি তুমি মুত্তাকী হও।'[৪১]

৬. শাফাআত এবং আর-রহমান

শাফাআত বা সুপারিশ; এই বিষয়ে কুরআনের সব আয়াত আল্লাহ নাম পাবেন। আল্লাহ বলেন :

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا

'বলুন, সকল সুপারিশ আল্লাহর (এখতিয়ারে)।'[৪২]

---

[৩৮] সূরা শুআরা, ৪২ : ১৭

[৩৯] সূরা আর-রহমান, ৫৫ : ১-২

[৪০] সূরা বাকারাহ, ২ : ৬৭

[৪১] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ১৮

[৪২] সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৪

শাফায়াত-সংক্রান্ত আয়াতে অন্য কোনো নামের দেখা না পেলেও আর-রহমানকে ঠিকই পাবেন।

আল্লাহ বলেন,

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

'সেদিন কারও সুপারিশ কাজে আসবে না, কেবল তার ব্যতীত যাকে আর-রহমান অনুমতি দেবেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হবেন।'[৪৩]

গুটিকয়েক উদাহরণ ছিল এগুলো। আর-রহমান নাম কতটা মর্যাদাপূর্ণ ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। ঠিক একই কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

'হে নবি! এদেরকে বলে দাও, আল্লাহ বা আর-রহমান যে নামেই ডাকো না কেন, সব উত্তম নামই তাঁর।'[৪৪]

নবিজি ﷺ-ও আমাদের শিখিয়েছেন, আল্লাহর দুটো প্রিয় নাম হতে যে-কোনো একটি দিয়ে বাচ্চাদের নাম রাখা যেতে পারে। প্রথমটি 'আবদুল্লাহ', আর দ্বিতীয়টি 'আবদুর-রহমান'।

আর-রহমানকে আমরা কতটুকু জানি?

الرَّحْمَٰنُ এবং الرَّحِيمُ দুটো নামই رَحْمَةٌ থেকে এসেছে।

ইবনু মানসুর এর ব্যাখ্যায় বলেন, الرِّقَّةُ والتَّعَطُّفُ অর্থাৎ 'অন্তরের দুর্বলতা, সদয় হওয়া।'

এটা হলো রহমতের শব্দের আভিধানিক অর্থ। মানুষ হিসেবে আমরা এই সংজ্ঞা নিজেদের বেলায় ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে? মোটেও না। এটা আল্লাহর সাথে শোভা পায় না। আমাদের আল্লাহকে কোনো দুর্বলতা স্পর্শ করে না। আমাদের স্রষ্টা আবেগ দ্বারা পরিচালিত হন না, যেমনটা আমরা হয়ে থাকি।

কোনো শিশুকে কষ্ট পেতে দেখলে আমাদের হৃদয় ভেঙে যায়, চোখযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে আসে। এই অনুভূতির কারণে শিশুটির প্রতি যত্নশীল হতে আমরা বাধ্য হই। মানব

---

[৪৩] সূরা ত্বহা, ২০ : ১০৯

[৪৪] সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ১১০

হৃদয়ের রহমত, দয়া, মমতা এমনই। কিন্তু মনের এই দুর্বলতার উদাহরণ কি আমরা আল্লাহর শানেও ব্যবহার করতে পারি? মোটেও না।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দয়া এবং আল্লাহর দয়ার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা দয়ার দ্বারা দুইভাবে উপকৃত হই। দয়ার মাধ্যমে দয়াপ্রার্থী উপকৃত হয়, আর দয়াকারী অপরাধবোধ ও আফসোস দূর করে। অর্থাৎ মানুষের দয়া করার ব্যাপারটা উভয়মুখী। কিন্তু আল্লাহর দয়া এরূপ নয়।

কাজেই, আল্লাহ তাআলার আর-রহমান—যা এসেছে 'রহমাহ' ধাতু থেকে—এবং আমাদের রহমাহ যদিও আপাতদৃষ্টিতে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়, তথাপি আল্লাহর দয়া এবং আমাদের দয়ার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য।

ইবনুল কাইয়িম ﷺ এর সমাধান দিয়েছেন। আল্লাহর দয়ার সংজ্ঞা কী হবে, মানুষের দয়া এবং আল্লাহর দয়ার মধ্যে পার্থক্য কী—এসবের উত্তরও দিয়েছেন এক বাক্যে। তিনি বলেন,

الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإنْ كرهتها نفسه، وشقَّتْ عليها

> "আর-রহমাহ একটি সিফাত (গুণ)। এ দ্বারা বোঝায়, বান্দার জন্য যা কিছু উপকারী ও কল্যাণকর—আল্লাহ সেগুলো পৌঁছে দেন। যদিও-বা বান্দার নফস তা অপছন্দ করে এবং কষ্টদায়ক মনে করে।"[৪৫]

আরও সহজ করে বলছি :

ধরুন, একজন মা। তিনি তার সন্তানকে পরীক্ষার পড়া রিভাইস করতে বাধ্য করেন এবং সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধুদের সাথে দেখা করা বন্ধ করে দেন। এখন সন্তানের অনুভূতি কেমন হবে? অবশ্যই সন্তান অপছন্দ করবে, কিন্তু তার মা এটাকে মমতা হিসেবেই দেখেন। আর সত্যি বলতে, মায়ের দৃষ্টিভঙ্গিই সঠিক।

যখন সন্তান ডান-বাম না দেখেই রাস্তা পার হতে নেয়, মা চিৎকার করতে থাকেন। সন্তানের ওপর কঠোর হন। তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করেন। স্রেফ আমাদের ভালোর জন্যই, এখানে তাঁর কোনো স্বার্থ নেই। আল্লাহ বলেন,

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

[৪৫] ইগাছাতুল লাহফান, ২/১৭৪

'আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করছেন, বস্তুত আল্লাহ বান্দাদের প্রতি খুবই স্নেহশীল।'[৪৬]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ-এর দেওয়া সংজ্ঞা এত গুরুত্ব দেবার কারণ কী? আমরা হয়তো প্রায়ই দেখে থাকি, মানুষ তার আশা পূরণে যখন ব্যর্থ হয়। দিনের-পর-দিন-বোনা-স্বপ্ন যখন স্বপ্নই থেকে যায়, তখন সে আল্লাহকে দোষারোপ করে। বস্তুত এই ধরণের মন্তব্য কেবল তারাই করে, যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর রহমত বুঝতে পারেনি। আল্লাহ ভালো করেই জানেন, যার জন্য আপনি এত অস্থির হয়েছিলেন, সেটা আপনার জন্য ক্ষতিকর। তাই আল্লাহর দয়া আপনার এবং আপনার ইচ্ছার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন আপনি ক্ষতিকর জিনিস থেকে বেঁচে যান। আপনাকে বাঁচানোর জন্যই আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ায় ওই বিষয়টিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ক্ষীণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আর-রহমানের রহমত দেখতে পাই না। কৃতজ্ঞতার বদলে আর-রহমানকেই দোষারোপ করে বসি। তাই তো কবি বলেন,

فَلَرُبَّمَا كَانَ الدُّخُولُ إِلَى العُلَا وَالْمَجْدِ مِنْ بَوَّابَةِ الأَحْزَانِ

'সফলতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় পৌঁছোতে কখনও কখনও দুঃখ-কষ্টের অসংখ্য দরজা অতিক্রম করতে হয়।'

জীবনের পরতে পরতে আর-রহমান

প্রায়ই মাসজিদের ইমামকে মিনতি-সুরে দুআ করতে শুনি। আমাদের শাইখগণ আল্লাহর দয়া চাইতে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। তারা নিজেরাও বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের প্রতি দয়া করো।'

তাত্ত্বিকভাবে এখন আমরা জানি দয়া বলতে কী বোঝায়। কিন্তু এরপরেও অনেকের মনে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। প্রশ্নটি নিয়ে তারা দোটানায় থাকেন। অনেক সময় লজ্জায় মুখ ফুটে তা বলতে পারেন না। প্রশ্নটা হলো— 'আমার ওপর যদি আল্লাহর দয়া থেকেই থাকে, তা হলে আবার দয়া ভিক্ষা চাওয়ার মানে কী?'

নিচের পয়েন্টগুলো মন দিয়ে পড়ুন, আল্লাহর দয়ার ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে ইন শা আল্লাহ :

---

[৪৬] সূরা আল ইমরান, ৩ : ৩০

১. কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে আর-রহমানের দয়া

আপনি যখন আল্লাহর কাছে এই বলে ফরিয়াদ করেন—'আল্লাহ, আমার প্রতি দয়া করুন', তখন আপনি মূলত আল্লাহর কাছে কুরআনের জ্ঞান চাচ্ছেন।

আল্লাহ বলেন,

الرَّحْمَٰنُ – عَلَّمَ الْقُرْآنَ – خَلَقَ الْإِنْسَانَ – عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

'আর-রহমান; এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন; তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তাকে কথা শিখিয়েছেন।'[৪৭]

এই আয়াতের ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কায়্যিম ﷺ তাঁর (الصواعق المرسلة) গ্রন্থে বলেন,

تأمل كَيْفَ جَعَلَ الْخَلْقَ وَالتَّعْلِيمَ نَاشِئًا عَنْ صِفَةِ الرَّحْمَةِ مُتَعَلِّقًا بِاسْمِ الرَّحْمَٰنِ

'গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ করুন, কীভাবে আল্লাহ তাআলা এখানে সৃষ্টি-করা এবং শিক্ষা-দেওয়ার কাজ দুটোকে 'রহমাহ'র গুণের সাথে সম্পর্কিত করেছেন এবং আর-রহমান নামের সাথে জুড়ে দিয়েছেন!'[৪৮]

২. দাওয়াতি কাজে দয়া

রহমত চাওয়ার আরেকটি অর্থ হলো সফল দাঈ হবার তাওফীক পাওয়া। যখন আল্লাহর দয়ার জন্য আপনি কাঁদছেন, তখন আল্লাহর কাছে সফল দাঈ হিসেবে কবুল হওয়ার জন্যই বলছেন। আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-কে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

'আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।'[৪৯]

সমাজের গড়পড়তা মুসলিমদের মতো জীবনটা কাটিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? মন থেকে চান আপনার ওসিলায় মানুষ আল্লাহর পথে ফিরে আসুক? জান্নাতের ভূমিতে আপনার জন্য ঘর নির্মাণ করা হোক? জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যেতে চান? তা হলে আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে চলে আসুন, তাঁর দয়ার ভিক্ষা চান।

---

[৪৭] সূরা আর-রহমান, ৫৫ : ১-৪

[৪৮] মুখতাসারু সাওয়াইকিল মুরসালাহ, ৩৬৯

[৪৯] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৫৯

৩. পাপমোচনে দয়া

খুব আশা কাজ করে, যদি সব গোনাহ মাফ করে দেওয়া হতো! স্মরণে আছে কিংবা ভুলে গেছেন—এমন সকল পাপের শাস্তি থেকে নিস্তার পেতে চান আপনি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'তোমাদের কেউ যদি অজ্ঞতাবশত কোনো খারাপ কাজ করে বসে, তারপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, তা হলে তিনি তাকে মাফ করে দেন এবং নরম নীতি অবলম্বন করেন, এটি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেরই প্রকাশ।।'[৫০]

দয়াময়ের রহমত যদি একটি বারের জন্য আপনার দিকে চোখ তুলে তাকায়, তা হলে পাহাড়সম পাপ নিমিষেই ধূলিকণায় পরিণত হবে। তিনি পরম দয়ালু, তাঁর দয়া ছাড়া আদম-সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৪. স্বপ্ন পূরণে দয়া

আল্লাহর দয়া ভিক্ষা চাওয়া মানে জীবনের সকল বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্তি পাওয়া। আল্লাহর দয়া পাওয়া মানে জীবনের স্বপ্নগুলো সত্য হওয়া। আর দয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে হারিয়ে-যাওয়া, তলিয়ে-যাওয়া সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে। আল্লাহর শপথ, কেউ হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে নরম রেশমি বিছানায় ঘুমানোর সামর্থ্য রাখে, সামর্থ্য রাখে সর্বোত্তম খাবার ক্রয়ের, কিন্তু এসবে যদি আল্লাহর দয়া না থাকে তা হলে রেশম হবে পাথরের বিছানা, আর দামি সুস্বাদু খাবার বিষে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে কেউ হয়তো পাথরের ওপরেই ঘুমায়, আয়-রোজগার সামান্য, দিন আনে দিন খায়, কিন্তু এতে যদি আল্লাহর দয়া থাকে তা হলে পাথরের বিছানাতেও সে রেশমি বিছানার মতো আরাম পাবে। দরিদ্রের কষাঘাতেও থাকবে প্রশান্ত। চরম মানসিক আঘাতের মুহূর্তগুলোও মনে হবে জান্নাতী সুখের মতো।

এ হলো সে রহমত, যা ইবরাহীম ﷺ পেয়েছিলেন, যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। তীব্র আগুনের তাপ গায়ে স্পর্শ করার আগেই তা রূপ নেয় সুশীতল হয়ে যায়।

এ হলো সেই রহমত, যা কারাগারের বন্দিদশায় পেয়েছিলেন ইউসুফ ﷺ। ফলে অন্ধকার-প্রকোষ্ঠ হয়েছিল সূর্যের আলোর থেকেও দীপ্তিমান।

---

[৫০] সূরা আনআম, ৬ : ৫৪

এ হলো সেই রহমত, যা মূসা ﷺ সন্ধান পেয়েছিলেন একজন জালিমের ঘরে বেড়ে ওঠার সময়। ফলে বাল্যকালে রক্তপিপাসু ফিরআউনের ঘরেও ছিলেন সবচেয়ে নিরাপদ, নিশ্চিন্ত।

এ হলো সেই রহমত, যা ইউনুস ﷺ পেয়েছিলেন মাছের পেটে বসে। ফলে মৃত্যুর খাদে পড়েও বেঁচে ফিরেছিলেন।

এ হলো সেই রহমত, যার সন্ধান আসহাবে কাহাফের যুবকেরা পেয়েছিল গুহার গভীর অন্ধকারে। ফলে সেই গুহা পরিণত হয়েছিল সর্বোত্তম আশ্রয়কেন্দ্রে।

এ হলো সেই রহমত, যা নসিব হলে দুঃখে-ভরা জীবনে সুখের দেখা মেলে। কষ্টগুলো পাল্টে যায়। আনন্দের বারিধারায় সিক্ত হয় গোটা জীবন। আর পদে-পদে-আসা পরীক্ষাগুলো প্রশান্তিকর মনে হয়।

আল্লাহ তাআলা যদি আপনার দুআ কবুল করেন, তাঁর অগণিত রহমত থেকে একটু দয়া বর্ষণ করেন, তবে আপনি হবেন পৃথিবীর সব থেকে সুখী। একবার নসিব হলে এই রহমত ছিনিয়ে নেবার শক্তি কারও নেই। আল্লাহ বলেন,

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

> 'মানুষের জন্য যে রহমত আল্লাহ উন্মুক্ত করে দেন, তা আটকে রাখবার কেউ নেই। এবং যা তিনি আটকে রাখেন, তা পাঠাবার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৫১]

দয়াময়ের দয়া থেকে বঞ্চিত যারা

এতকিছুর পরেও এমন মানুষ থাকবেই, যারা আল্লাহর দয়া থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে। মানুষগুলো অতি আশাবাদী প্রকৃতির। এরা বোঝে না দয়া পেতে চেষ্টা করতে হয়, সাধনা করতে হয়। সাময়িক সময়ের চেষ্টা-সাধনা করতে তারা অপারগ। ফলে আল্লাহর বিশেষ দয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যায় আজীবন। আল্লাহর দয়া পেতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। চোখের পানি ঝরিয়ে কাঁদতে হয়। ত্যাগের দরিয়া পাড়ি দিতে হয়। এই বিষয়গুলো তারা এড়িয়ে যায়। খুব সম্ভব তারা এই আয়াতটি পড়েনি, যেখানে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, কারা তাঁর রহমত পাওয়ার যোগ্য :

---

[৫১] সূরা ফাতির, ৩৫ : ২

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

'আর আমার অনুগ্রহ সব জিনিসের ওপর পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। কাজেই তা আমি এমন লোকদের নামে লিখবে যারা নাফরমানি থেকে দূরে থাকবে, যাকাত দেবে এবং আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনবে।'[৫২]

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ

'যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সাজদাবনত থাকে এবং দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের দয়া আশা করে (সে কি তার মতো, যে এরূপ করে না)?'[৫৩]

قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'(সালিহ) বলল, "হে আমার জাতির লোকেরা! ভালোর পূর্বে তোমরা মন্দকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ কেন?আল্লাহর কাছে মাগফিরাত চাচ্ছ না কেন? হয়তো তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে।'[৫৪]

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমার প্রতি দয়া করা হয়।'[৫৫]

ادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

'তাঁকে ডাকো ভয় ও আশা নিয়ে। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।'[৫৬]

নিছক আশা দিয়ে দয়া নসিব হয় না। দয়া পেতে কাজে নামতে হয়, কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়, পাপের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ছেড়ে দিতে হয়। আর আল্লাহ যখন আপনার মধ্যে দৃঢ় ইচ্ছা দেখবেন, তিনি তাঁর অসীম রহমত বর্ষণ করবেন। কাজেই

---

[৫২] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৬

[৫৩] সূরা যুমার, ৩৯ : ৯

[৫৪] সূরা নামাল, ২৭ : ৪৬

[৫৫] সূরা নূর, ২৪ : ৫৬

[৫৬] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৬

আল্লাহর রহমতের বারিধারায় নিজেকে সিক্ত করুন। আর-রহমানের অসীম দয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না।

একটি বার ভাবুন, মুখে সিগারেট রেখে আমরা আল্লাহর দয়া পাবার আশা করতে পারি না। টিভিতে কিংবা ইন্টারনেটে অশ্লীল দৃশ্য দেখার সময়, কিংবা কান দিয়ে হারাম গান শোনার মুহূর্তে আমাদের ওপর আল্লাহ্ দয়া করবেন, এটাও আমরা আশা করতে পারি না।

সত্যি করে বলুন তো, কীভাবে আমরা তাঁর দয়া আশা করতে পারি? আমরা তো নানান অজুহাত দেখিয়ে পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ এড়িয়ে চলছি! কীভাবে আমরা আল্লাহর দয়া আশা করতে পারি, অথচ পাপের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি!

পাপের দরিয়া ছেড়ে আসার বাসনা সবার হৃদয়েই থাকা উচিত। পাপীদের আড্ডাখানা ছেড়ে আসাটা গুহায় আশ্রয় নেবার সিদ্ধান্তের মতোই। যখন পাপাচার চারিদিক ঘিরে ফেলল, তখন আসহাবে কাহাফের যুবকেরা একে অপরকে বলেছিল :

فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا

> 'গুহায় আশ্রয় নাও। তা হলে তোমাদের রব তোমাদের জন্য তাঁর রহমত উন্মুক্ত করে দেবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনোপকরণের বিষয়টি সহজ করে দেবেন।'[৫৭]

গুহা কোনো আরামের জায়গা নয়। বড়োই অস্বস্তিকর, জনমানবশূন্য, অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি জায়গার নাম গুহা। তা স্বত্ত্বেও তাদের দৃঢ়-বিশ্বাস, দয়াময়ের অনুগ্রহ একদিন আসবেই। এই কঠিন পরীক্ষা থেকে একদিন নিস্তার মিলবেই। হ্যাঁ, এসেছিল। সত্যিই এসেছিল। এমনভাবে এসেছিল, যা মানব-ইতিহাসকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আর আল্লাহর সাহায্য যখন আসে, এভাবেই আসে।

তাই বলে সবাইকে কি আক্ষরিক অর্থেই গুহায় আশ্রয় নিতে হবে?

না। কারও জন্য গুহায় আশ্রয় নেওয়া মানে হলো অন্তরের অন্তস্তল থেকে তাওবা করা। পাপে জর্জরিত সমাজে দ্বীনদার সঙ্গী খুঁজে পাওয়া, তার সাথে জান্নাতের দিকে ছুটে চলা। কারও জন্য গুহায় আশ্রয় নেওয়া মানে প্রতিদিন কুরআনের সাথে কিছু মুহূর্ত কাটানো, কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। কারও জন্য গুহায় আশ্রয় নেওয়া মানে মাসজিদে যাওয়া, আল্লাহর ঘরের সাথে অন্তর জুড়ে রাখা।

---

[৫৭] সূরা কাহফ, ১৮ : ১৬

যখন সমাজের সর্বস্তরে পাপ ঢুকে পড়েছিল, তখন নির্মল পরিবেশেও তাদের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তাওহীদের কথা বলায় আপন মানুষগুলোও শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। তখন আসহাবে কাহাফের যুবকেরা আল্লাহর দয়ার সাক্ষাৎ পেয়েছিল। হ্যাঁ গুহাতেই। তদ্রূপ গুহা কিন্তু আমার আপনার জীবনেও আছে। আপাতদৃষ্টিতে তা গুহা মনে হলেও আসলে সেটি গুহা নয়, মুক্তি!

মুক্তির সেই দরজা আজও খোলা আছে। আল্লাহর রহমত আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। জীবনের কান্নাকে হাসিতে পরিণত করতে এবং দুঃখকে সুখের চাদরে ঢেকে দিতে সে অপেক্ষা করছে। ফিরে আসুন, ফিরে আসুন আর-রহমানের ছায়াতলে...

ইবাদুর রহমান যারা

সদ্য-গ্রাজুয়েশন-সম্পন্ন-করা এক যুবক, দীর্ঘ প্রতিক্ষা শেষে স্বপ্নের চাকরিটা যখন পেয়ে যায়, তার মনে খুব আগ্রহ কাজ করে; জানতে চায় তার বস তার কাছে কী আশা করে।

নতুন দম্পতীর বেলাতেও এমনটা ঘটে। যারা দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের সঙ্গীর জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছিল। সেই প্রিয় মানুষটিকে কাছে পেলে তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কীভাবে তাকে খুশি করা যায়!

এগুলো দুনিয়ার মানুষদের সন্তুষ্টি অর্জনে আমাদের আগ্রহের নমুনা। তারা কিন্তু আমাদের সৃষ্টি করেনি আর রিযকও দেয় না। তা হলে একজন বান্দা হিসেবে তার রবকে, তার মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্য কী পরিমাণ আগ্রহ থাকা উচিত? অথচ তাঁর হাতেই দুনিয়া এবং আখিরাত—উভয় জাহানের সফলতার চাবি।

সত্যি বলতে কী, স্রেফ আমলের জোরে আল্লাহর সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি এবং তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব নয় কারও পক্ষেই। তা হলে আমরা কীভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারব? কী করলে তিনি আমার প্রতি রাজি-খুশি হবেন?

আল্লাহ তাআলা গোপন রাখেননি। যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তাদের পুরস্কার আমি পাঠকদের কল্পনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। আজ শুধু আমরা সেসব বান্দাদের বৈশিষ্ট্য জানবো, যাদের কথা সূরা ফুরকানে এসেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের নাম দিয়েছেন 'ইবাদুর-রহমান' অর্থাৎ রহমানের বান্দাগণ।

চলুন, আমরা রহমানের প্রকৃত বান্দাদের সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি।

১) বিনয় চলে তাদের পায়ে পায়ে

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, *‘আর-রহমানের বান্দা তারাই, যারা জমিনে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে।’*[৫৮]

আপনি বলতে পারেন, এখানে বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের কথা বলা হচ্ছে। তারা হাঁটার সময় সচেতন থাকে। শুধু কি এতটুকুই? না, বরং তাদের হাঁটায় থাকে না দাম্ভিকতার ছাপ। তারা দুনিয়ার বিষয়সমূহকে গ্রহণ করে নম্রতার সাথে। এই অনুধাবন নিয়ে তারা চলাফেরা করে যে, তারা আল্লাহর জমিনে হাঁটছে, আল্লাহর দেওয়া অক্সিজেনে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। যানবাহন, নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবকিছুকে ‘আল্লাহ ধার দিয়েছেন’, এভাবেই তারা চিন্তা করে।

লুকমান ﷺ তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন,

> ‘জমিনে দম্ভভরে চলো না। তুমি জমিনকে চিরে ফেলতেও পারবে না, পাহাড়ের উচ্চতাতেও পৌঁছোতে পারবে না।’[৫৯]

রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘একবার (পূর্ববর্তী উম্মতের) এক ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, চুল পরিপাটি করে অহংকারের সাথে চলাফেরা করছিল। এমন সময় আল্লাহ্ তার (পায়ের নিচের মাটিকে) ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামাত-দিবস পর্যন্ত মাটির নিচে যেতেই থাকবে।’[৬০]

রহমানের সত্যিকারের বান্দারা আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করতে পারে। আর এর প্রভাব তাদের চলাফেরাতেও ফুটে ওঠে।

২) ক্রোধের মুখেও লাগাম ছুটে না তাদের

আল্লাহ্ বলেন, ‘*..এবং তাদেরকে যখন মূর্খরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, “সালাম।”*’[৬১]

রহমানের বান্দারা অজ্ঞদের সাথে মূর্খসুলভ আচরণ করে না। অপমানের জবাবে অপমান করে না। বরং বৃহত্তর কল্যাণের কথা মাথায় রেখে সংযমের পথ অবলম্বন করে।

একবার আবুদ দারদা ﷺ-কে এক ব্যক্তি অপমানসূচক কথা বলল। তিনি জবাব দিলেন,

[৫৮] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৩
[৫৯] সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩৭
[৬০] বুখারি : ৫৭৮৯
[৬১] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৩

'হে অমুক! আমাকে গালি দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে যেয়ো না, সংশোধনের পথটাও খোলা রেখো। শুনো, যে আমার জন্য আল্লাহর অবাধ্য হয় আমি তার জবাব আল্লাহর আনুগত্যের দ্বারা দিই।'

আরেকবার ইমাম শা'বি ﷺ-কে এক ব্যক্তি অপমান করে। তিনি উত্তর দেন, 'তুমি যা বললে আমি যদি তা হয়ে থাকি, আল্লাহ্ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আর যদি আমি না হয়ে থাকি, তা হলে দুআ করছি তিনি যেন তোমাকে ক্ষমা করে দেন।'

এক ব্যক্তি দিরার ইবনু কা'কা ﷺ-কে বলল, 'আল্লাহর শপথ, আপনি যদি একটা বলেন, আমি এর উত্তরে দশটা পাল্টা জবাব দেব।'

তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর শপথ, তুমি যদি দশটা বলো, আমি একটারও পাল্টা জবাব দেব না।'

এই দুনিয়াতে চলতে-ফিরতে একজন মুমিনকে অনেককিছুই স্মরণে রাখতে হয়। কারণ, সে আল্লাহর পথের পথিক। তার অন্তরে কারও অপমান ঢোকার জায়গা নেই। তাদের নিয়ে ভাবারও সময় নেই। জীবনকে সে একটা বাজারের মতো করে দেখে। খানিক বাদেই তা বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে কেউ লাভ করে ফিরে, কেউ-বা সব খুইয়ে।

৩) কিয়ামুল লাইল তাদের পরিচয়

রাতের আঁধারে রহমানের বান্দারা কেমন? মানুষ যখন নরম বিছানায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন রুকু, সাজদায়, আল্লাহর দরজায় কড়া নেড়ে নেড়ে রাত কাটায়।

আল্লাহ্ বলেন, *'এবং যারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রবের উদ্দেশ্যে সাজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে।'*[৬২]

মদীনায় পৌঁছে রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম এই দাওয়াহ্ দিয়েছিলেন, 'হে মানবসকল! মানুষদের খাওয়াও, এবং সালাম ছড়িয়ে দাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক ধরে রাখো, এবং রাতে সালাত আদায় করো যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। তা হলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৬৩]

কিয়াম হলো আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া। এটা কীভাবে সম্ভব, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে ডাকছেন অথচ আপনি তাঁর ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না? আপনার সহকর্মী,

---

[৬২] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৪
[৬৩] তিরমিযি, ২৪৮৭

অফিসের বস কিংবা বন্ধু যদি আপনাকে ফোনকল অথবা মেসেজ দিত, তবে কি আপনি এর উত্তর দিতেন না? অবশ্যই দিতেন। তারা যে আপনার খোঁজখবর নিচ্ছে, এটা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন। তা হলে আল্লাহর ডাকে কেন সাড়া দেবেন না?

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ نَزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ

'আল্লাহ তাআলা প্রতিরাতে রাতের তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন—কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছে এমন, যে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে তা দেব? কে আছে এমন, যে কিনা আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব?'[৬৪]

আল্লাহ তাআলা আমাদের ডাকছেন। জানতে চাচ্ছেন—কার কী প্রয়োজন আছে। অথচ এ সময় মানুষ গভীর ঘুমে নাক ডাকতে থাকে। আল্লাহর ডাকে সারা দেবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করে না। আফসোস আমাদের জন্য। অথচ সালাফ আস-সালিহীনদের কাছে তাহাজ্জুদ ছিল প্রথম সারির ইবাদাত। এর মাধ্যমে তারা অন্তরে তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করতেন। রাতের সালাত আদায় করতে না পারলে তারা বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে রাতের সালাত আদায়ের তাওফিক দিন। আর এটা যদি আমার তাকদিরে না লেখা থাকে, তবে আমাকে দুনিয়ার বুক থেকে উঠিয়ে নিন।'

তাহাজ্জুদকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করতে হবে। এটা খুবই জরুরি। নিজের যত প্রয়োজন আছে, সেগুলো গভীর রাতে আল্লাহর দরবারে পেশ করতে হবে। সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলতে হবে। শেষরাতে আল্লাহ যখন বান্দার সবচেয়ে কাছে চলে আসেন, তখন তাঁর হামদ ও তাসবীহ পাঠ করতে হবে। তবেই আমাদের জীবন সুন্দর হবে। আর রহমানের বান্দা হিসেবে কিয়ামাতের দিন আমরা বিশেষ মর্যাদা লাভ করব ইন শা আল্লাহ।

৪) দুআয় তারা অনন্য

আল্লাহ বলেন, *'এবং যারা বলে, "আমাদের রব, আপনি আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন, তার শাস্তি তো নিশ্চিতভাবে ধ্বংসাত্মক।"'*[৬৫]

[৬৪] *আস-সুন্নাহ*: ১০৮৯; *আশ-শারীআত*: ৭০১; *আন-নুযুল*: ১২

[৬৫] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৫

রহমানের বান্দাদের দুআ কেবল দুনিয়াকে ঘিরে হয় না। বরং প্রত্যেক দুআয় তারা আল্লাহর কাছে ভয়াবহ আযাব থেকে পানাহ চায়। জাহান্নামের হিংস্রতা থেকে আশ্রয় চায়। তারা যদিও ধার্মিক, তাহাজ্জুদগুজার ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী, তবুও তারা আশঙ্কা করতে থাকে—'হয়তো আমি জান্নাতে পৌঁছোতে পারব না।' তারা অল্প আমল করেই আত্মতুষ্টিতে ভোগে না।

আবদুল্লাহ ইবনু শিখখির ﷺ বলেন, 'আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট গেলাম, তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। তখন কান্নার ফলে তাঁর বুক থেকে যে শব্দ বের হচ্ছিল, তা ফুটন্ত পানির মতো শোনাচ্ছিল।'[৬৬]

৫) তাদের দানে অপচয় থাকে না

'এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না, আর তাদের পন্থা হয় এই দুয়ের মধ্যবর্তী।'[৬৭]

রহমানের বান্দারা সর্বদা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে চলে; এমনকি দানের বেলাতেও।

মুজাহিদ ﷺ বলেন, 'তুমি এক পর্বত সমতুল্য সোনাও যদি আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করো, এটা অপচয় হবে না। আর আল্লাহর অবাধ্যতায় কয়েক মুষ্টিও যদি ব্যয় করো, তা হবে নির্ঘাত অপচয়।'[৬৮]

ইবনু যাইদ ﷺ বলেন, 'কৃপণতা হচ্ছে—যখন ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করা হতে বিরত থাকে।'

রহমানের সত্যিকারের বান্দারা নিজেদের যাকাত দ্রুত আদায় করে, উত্তম কাজে সম্পদ দ্রুত ব্যয় করে। পরিবার এবং অধীনস্থদের পেছনে প্রয়োজন-অনুপাতে ব্যয় করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। অপরদিকে একটি টাকা কিংবা এর চেয়েও কম পরিমাণ অর্থ হারাম পথে ব্যয় করাকে অপচয় গণ্য করে। সুদী কারবারে এক টাকা লাগানোকেও নিন্দনীয় দৃষ্টিতে দেখে। তবে রহমানের সত্যিকারের বান্দাগণ কেবল হারাম পথেই নয়, বরং হালাল পথেও অপব্যয় করা হতে বিরত থাকে।

উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন,

'অপচয়কারী হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, ব্যক্তির যখন যা ইচ্ছে করবে, সে কিনবে আর

[৬৬] আবূ দাউদ, ৯০৪; সহীহ
[৬৭] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৭
[৬৮] তাফসীর আত-তাবারি, ১৭/৪৯৮

খাবে।'[৬৯]

৬) তারা পাপ থেকে দূরে থাকে

'তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন কোনো সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। এসব যে-ই করে সে তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামাতের দিন তাকে উপর্যুপরি শাস্তি দেওয়া হবে এবং সেখানেই সে পড়ে থাকবে চিরকাল লাঞ্ছিত অবস্থায়।'[৭০]

মোদ্দা কথা, তারা কবিরা গুনাহের ব্যাপারে সদা সতর্ক। পাশাপাশি ছগিরা গুনাহ থেকেও যথাসম্ভব দূরে থাকে।

একবার রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কোন গুনাহ সবচেয়ে বড়ো?' তিনি বলেন, 'তুমি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করবে, অথচ তিনি তোমার স্রষ্টা।' এরপর কোনটা? তিনি বললেন, 'তোমার খাবার খেয়ে ফেলবে এই ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা।' তারপর? 'প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা।' বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه বলেন, 'এরপর ওপরের আয়াতগুলো নাযিল হয়।'[৭১]

পাঠক হয়তো ভাবছেন, 'আমি তো এসব পাপের মধ্যে কিছু পাপ ইতিমধ্যে করে ফেলেছি! এখন এই শাস্তি থেকে পরিত্রাণের উপায় আছে কী? দ্বিগুণ শাস্তি নিয়ে আমার খুব ভয় হচ্ছে।'

উত্তরটি এর পরের আয়াতেই আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন,

> 'তারা ব্যতীত যারা তাওবা করে এবং ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে নেক আমল দ্বারা পাল্টে দেবেন। আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।' [৭২]

'আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে নেক আমল দ্বারা পাল্টে দেবেন'—এই কথার অর্থ কী? মুফাসসিরদের একাধিক মত বর্ণিত রয়েছে।

সাহাবি ইবনু আব্বাস رضي الله عنه, হাসান বাসরি رحمه الله এবং অন্যরা বলেছেন, 'পাপের বদলে আল্লাহ তাদের নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন এবং তাদের খারাপ গুণগুলো ভালো

---

[৬৯] তাফসীর আল-কুরতুবি, ১৩/৭৩
[৭০] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৮-৬৯
[৭১] বুখারি, ৭৫৩২
[৭২] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭০

গুণ দ্বারা পাল্টে দেবেন।' কেউ আবার আয়াতের আক্ষরিক অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের কৃত-পাপসমূহ নেক আমলে পাল্টে দেবেন।

রাসূল ﷺ বলেছেন, '(কিয়ামাতের দিন) এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে বলা হবে : তার ছগিরা গুনাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করো এবং কবিরা গুনাহগুলো গোপন রাখো। তাকে বলা হবে, তুমি অমুক অমুক দিন এই এই পাপ করেছ। অতঃপর তাকে বলা হবে, আমরা তোমার এই পাপগুলোকে ভালো আমলে পাল্টে দিচ্ছি। তখন সে ব্যক্তি বলে উঠবে, আমার রব, আমি তো আরও পাপ করেছি। সেগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি না!'

বর্ণনাকারী বলেন, 'অতঃপর রাসূল ﷺ হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁতও দেখা যাচ্ছিল।'[৭৩]

৭) পাপ কাজে হয় না কারও সঙ্গী

'(আর রহমানের বান্দা হচ্ছে তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং কোনো বাজে জিনিসের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকলে ভদ্রলোকের মতো অতিক্রম করে যায়।'[৭৪]

টেলিভিশন, কম্পিউটার-মোবাইলের পর্দায়, কিংবা বন্ধুর সাথে একান্ত আলাপনে মিথ্যা বা অমার্জিত কিছু শুনলে রহমানের সত্যিকারের বান্দারা দ্রুত কেটে পড়ে। নিজেদের মর্যাদা রক্ষার্থে দূরে সরে যায়। এগুলো আমলে নেয় না।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, '... কোনো বাজে জিনিসের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকলে ভদ্রলোকের মতো অতিক্রম করে যায়।' অর্থাৎ তারা এসবে মন দেয় না, এগুলো এড়িয়ে চলে।

৮) কুরআনের সাথে জুড়ে থাকে মন

'তাদের যদি তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেওয়া হয়, তা হলে তারা তার প্রতি অন্ধ বধির হয়ে থাকে না।'[৭৫]

তাদের জীবনে পরিলক্ষিত হয় কুরআনের অভূতপূর্ব প্রভাব। তারা গানের মতো করে কুরআন তিলাওয়াত করে না, কিংবা পত্রিকার মতো এক নিঃশ্বাসে পড়ে যায় না। ধীরে

---

[৭৩] মুসলিম, ১৯০
[৭৪] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭২
[৭৫] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭৩।

ধীরে পড়ে, অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের চোখ হয় অশ্রুসিক্ত এবং জীবনে আসে অকৃত্রিম পরিবর্তন। তাদের এই কুরআন তিলাওয়াত পাল্টে দেয় অন্যদেরও। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

> 'মুমিন তো কেবল তারাই, আল্লাহর আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, এবং যখন তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা শুধু তাদের রবের ওপরেই তাওয়াক্কুল করে।'[৭৬]

৯) শুধু নিজের কথাই ভাবে না

'তারা প্রার্থনা করে থাকে, "হে আমাদের রব, আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের ও নিজেদের সন্তানদেরকে চক্ষুশীতলকারী বানাও এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকিদের ইমাম।"'[৭৭]

রহমানের সত্যিকারের বান্দারা আশা করে, তাদের উত্তরসূরিরা দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে তাদের জন্য হবে চোখজুড়ানো প্রশান্তির। সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি, সহায়-সম্পদ এবং দুনিয়াবি সফলতা—এগুলো তাদের কাছে মানদণ্ড নয়। বরং সন্তানকে নেককার, মুত্তাকী দেখতে চায়, আল্লাহর ইবাদাতগুজার এবং তাঁর পথের দাঈ হিসেবে দেখতে চায় তারা। এটাই তাদের কাছে চোখজুড়ানো প্রশান্তি, কুররাতু আইয়ুন।

সেই সাথে শুধু স্ত্রী-সন্তানের জন্য দুআ করেই ক্ষান্ত হয় না, তারা নিজেদেরকেও দ্বীন ইসলামের আলোকে একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বরূপে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর; যাতে ইন্তেকালের পরও তাদের সাওয়াবের রাস্তা বন্ধ না হয়।

রাসূল ﷺ বলেন, 'আদম-সন্তান যখন মারা যায়, তিনটি বিষয় ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় : (১) সদাকায়ে জারিয়াহ (অর্থাৎ যে দানের ফলে তার মৃত্যুর পরেও অন্যরা উপকৃত হয়); (২) উপকারী ইলম (অর্থাৎ যে ইলম সে শিখিয়ে গেছে মানবকল্যাণে); (৩) নেক সন্তান, যে কিনা তার জন্য দুআ করে।'[৭৮]

১০) তাদের জন্য আল্লাহর অসীম পুরস্কার

উৎকৃষ্ট গুণসমূহ অর্জনে নিরলস পরিশ্রমের প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তাদের কাঙ্ক্ষিত

---

[৭৬] সূরা আল-আনফাল, ৮ : ২
[৭৭] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭৪
[৭৮] মুসলিম, ১৬৩১

পুরস্কার দেবেন, বরং তাদের কল্পনার চেয়েও বেশি দেবেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

'তারাই, যাদেরকে প্রতিদান হিসেবে দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। এবং তাদেরকে সেখানে অভিবাদন ও সালাম-সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হবে। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। আশ্রয়স্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কতই-না উৎকৃষ্ট!'[৭৯]

আল্লাহর নির্দেশ পালনে রহমানের বান্দারা ধৈর্যের পরিচয় দেয়। হারাম বিষয় থেকে বিরত থাকে। নফসের তাবেদারি করে না। একমাত্র আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজের ইচ্ছাকে ছেড়ে দেয়। এমন কর্মের প্রতিদান জান্নাতের চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে?

'(জান্নাতে) তোমরা থাকবে সদা জীবিত, মৃত্যু তোমাদের কখনও গ্রাস করবে না। এবং তোমরা থাকবে সদা সুস্থ, অসুস্থতা তোমাদের কখনও স্পর্শ করবে না। তোমরা হবে চির-যৌবনের অধিকারী, বার্ধক্য তোমাদের পেয়ে বসবে না। এবং তোমরা থাকবে সন্তুষ্ট, হতাশা কখনও স্পর্শ করবে না।'[৮০]

নবি ﷺ বলেন,

জান্নাতবাসীরা তাদের ওপরের স্তরের বাসিন্দাদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমনটা তোমরা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের দীপ্তিমান নক্ষত্রকে দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মর্যাদাগত পার্থ্যকের কারণে। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, ওটা তো নবিদের জায়গা। তাঁরা ব্যতীত কেউই তো সেখানে পৌঁছোতে পারবে না। নবি ﷺ বললেন, হ্যাঁ। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! (ওসব লোকেরাও সেখানে পৌঁছে যাবে), যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে মেনে নেবে।[৮১]

অবশ্যই, যারা মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি কঠোর সাধনা করে, তাদের জন্যই এমন সম্মানজনক স্থান। তারাই হচ্ছে সত্যিকারার্থে রহমানের বান্দা—ইবাদুর রহমান।

হে আল্লাহ, আমরা ঈমান এনেছি আপনার ওপর, আপনার নবি-রাসূলদের সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছি এবং তাদের শেখানো পথেই নিজেদের আত্মনিয়োগ করেছি। অতএব আল্লাহ, আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারকে এমন সম্মানজনক স্থান প্রদান করুন যার ওয়াদা আপনি দিয়েছেন, আমাদেরকে আপনার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। ইয়া রহমান!

---

[৭৯] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭৫-৭৬
[৮০] মুসলিম, ২৮৩৭
[[৮১]] বুখারি, ৩২৫৬

নির্মল অন্তর

এক দেশে এক জেলে বাস করত। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত সমুদ্র-সৈকতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু দিনশেষে মাত্র দুটো মাছ নিয়ে ফিরত। একটি মাছ ঘরের লোকদের দিত রান্না করার জন্য, আরেকটি বাজারে বিক্রি করত।

তার এই স্বভাব দেখে একদিন তার এক বন্ধু জানতে চাইল, 'কেন তুমি দুটো মাছ ধরেই ক্ষান্ত থাকো? চার-পাঁচটা কিংবা দশটা ধরো না কেন?'

সে বলল, আচ্ছা। তা না হয় ধরলাম। তারপর?

–তা হলে তুমি আরও ধনী হতে পারবে।

–আচ্ছা। তারপর?

–তুমি লোক খাটাতে পারবে। তারা তোমার হয়ে মাছ ধরবে।

–তারপর?

–এভাবে চলতে থাকলে একদিন তুমি অনেক টাকার মালিক হয়ে যাবে। বড়ো একটা নৌকা কিনতে পারবে। নৌকা দিয়ে বেশি বেশি মাছ ধরতে পারবে।

–তারপর?

–তুমি নৌবহরে টাকা খাটাতে পারবে। ফলে আরও ধনী হতে থাকবে।

–তারপর কী হবে?

–তারপর নিজেই একটা মাছের আড়ত খুলে বসতে পারবে শহরে।

–তারপর?

–ব্যবসা আরও বড়ো পরিসরে করতে পারবে এবং বাজারের নেতা পর্যায়ের ব্যবসায়ী হতে পারবে।

_তারপর কী?

_এভাবে একদিন তুমি কোটিপতি হয়ে যাবে!

_আচ্ছা! এরপর?

_এরপর শুধু শান্তি আর শান্তি।

সব শুনে লোকটি বলল, 'ভাই আমার, আমি তো এখন শান্তিতেই আছি!'

অর্থাৎ তুমি আমাকে এমন এক দেশে কেন নিয়ে যেতে চাও, যেখানে আমি ইতিপূর্বেই পৌঁছে গেছি?! আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট। আমার আর প্রয়োজন নেই।

কতই-না চমৎকার আল্লাহর রাসূলের কথা! তিনি ﷺ এই গল্পের পুরো শিক্ষাটি এক বাক্যে বলে দিয়েছেন,

لَيسَ الغِنَى عن كَثْرَةِ العَرَضِ، ولَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ

> 'অধিক অর্থ সম্পদের মধ্যে ধনাঢ্যতা নেই। প্রকৃত ধনাঢ্যতা হলো অন্তরের ধনাঢ্যতা।'[৮২]

অঢেল অর্থ সম্পদ, কিংবা ভালো পজিশনে থাকলেই ধনী হওয়া যায় না। তিনি বলেছেন, প্রকৃত ধনাঢ্যতা হলো যখন আপনার অন্তর পরিতৃপ্ত থাকে, প্রশান্ত থাকে। তখনই আপনি ধনী, সমৃদ্ধিশালী।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, দুনিয়ার এই জীবনে আমরা সকলেই মুসাফির। আর একজন মুসাফির হিসেবে আপনার কতটুকু পাথেয় প্রয়োজন? সোশ্যাল মিডিয়া ও টেলিভিশন অনেককিছুরই লোভ দেখাবে। বস্তুত আমাদের যাত্রাপথে সেগুলোর প্রয়োজন নেই। মুসাফিরের ব্যাগে অতিরিক্ত কীই-বা থাকতে পারে?

মনে রাখবেন, কিয়ামাতের দিন যার বোঝা যত হালকা হবে, সে জান্নাত-পানে সে ততই দ্রুতগতিতে ছুটে যাবে।

কাজেই আমাদের জীবনের একটিই স্লোগান হোক, একটিই লক্ষ্য হোক :

'ওগো আল্লাহ, তুমি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকো, তা হলে তুমি আমাকে কী দিয়েছ আর কী দাওনি এগুলোর তোয়াক্কা করি না। হে আল্লাহ, তুমি শুধু আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তা হলেই আমি সফল!'

---

[৮২] বুখারি : ৬৪৪৬

যে পথ জান্নাতে গিয়ে মিশেছে

জ্ঞানীগুণী হওয়া সম্মানের বিষয়। আর সম্মান সবাই প্রত্যাশা করে। জাহিল বা মূর্খ উপাধি পছন্দ করে না কেউই। তাই বলে এই সমাজে যে মূর্খদের অস্তিত্ব নেই—তা কিন্তু নয়। স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান আমাদের কাছে একটি মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। ফেরেশতাদের ওপর আদম ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্ব এই জ্ঞানের কারণেই ছিল।

আল্লাহ বলেন,

عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

'আদমকে তিনি সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন।'[৮৩]

কেবল মানুষের বেলাতেই নয়, আল্লাহ তাআলা পশু-পাখিদের ব্যাপারেও প্রশিক্ষিত পশু-পাখিকে অপ্রশিক্ষিতদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। মুসলিমদের জন্য হালাল খাদ্য-তালিকায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

'আর যেসব শিকারি প্রাণীকে তোমরা শিক্ষিত করে তুলেছ, যাদেরকে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমরা শিকার করা শিখিয়েছ, তারা তোমাদের জন্য যেসব প্রাণী ধরে আনে, তাও তোমরা খেতে পারো।'[৮৪]

প্রশিক্ষিত পশু-পাখির ধরে-আনা-শিকার খাওয়া হালাল। পক্ষান্তরে পশু যদি অপ্রশিক্ষিত হয়, তবে সে জিনিস হারাম বলে গণ্য হবে।

---

[৮৩] সূরা বাকারাহ, ২ : ৩১
[৮৪] সূরা মাইদা, ৫ : ৪

এভাবে জ্ঞানের মর্যাদা নিয়ে অসংখ্য দলিল আছে। তা হলে ভাবুন সেগুলো কতটা জোরালোভাবে জ্ঞানকে সমুন্নত স্তরে পৌঁছে দিয়েছে! সেই অগণিত প্রমাণের ভিতর এটি অন্যতম, আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে জানিয়েছেন মুমিনরা মর্যাদায় একে অপরের সমান নয়।

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ্‌ উন্নীত করবেন।'[৮৫]

আরেক আয়াতে বলেছেন,

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?'[৮৬]

না, তারা এক নয়। জীবনযাপন ও কাজে-কর্মে তারা আলাদা। মৃত্যু, কবরের অবস্থা ও পুনরুত্থানের ক্ষেত্রেও তারা একে অপরের চেয়ে আলাদা। হাশরের ময়দানেও তাদের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। পুলসিরাত পারাপারে তাদের গতি এবং জান্নাতে মর্যাদার ক্ষেত্রেও তারা সমান নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা আলাদা।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের পথে চলে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।'[৮৭]

ইলমের মর্যাদা আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যে ইলম আমাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানাটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

শুরুর দিকে সকল দ্বীন-শিক্ষার্থীর আসল বাড়ি জান্নাতে হবে না। কেননা তাদের সাথে-থাকা ফেরেশতারা এমন কিছু উপস্থাপন করবে, যা তারা কল্পনা করতেও পারেনি। একদিন ওগুলো সব প্রকাশ পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাদের ইলম ছিল, হয়তো জান্নাতীদের

[৮৫] সূরা মুজাদিলা, ৫৮ : ১১
[৮৬] সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ৯
[৮৭] ইবনু মাজাহ, ১৮৩; সহীহ

চেয়ে বেশিই ছিল, কিন্তু তারা ইলমের সদ্ব্যবহার করেনি। পথচ্যুত হয়েছে, প্রকৃত লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এরপরেও ধরে নিয়েছে যে, সবকিছু ঠিকভাবেই চলছে।

এই কারণেই আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের সালাত শেষ করে এই দুআটি পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান চাই, পবিত্র রিযক চাই, এবং কবুলযোগ্য আমলের তাওফীক চাই।'[৮৮]

সাহাবিদেরকেও বলতেন,

سَلُوا اللهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

'তোমরা আল্লাহর কাছে উপকারী ইলম চাও এবং অনুপকারী ইলম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো।'[৮৯]

উপকারী ইলমের বৈশিষ্ট্যগুলো কী, যা অর্জনের দ্বারা আমরা সত্যিকার অর্থে জান্নাতে পৌঁছে যাব?

১) আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি করে

উপকারী ইলমের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, তা আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি করে। এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। একটি আয়াতে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

'শুধুমাত্র তাঁর এমন বান্দারাই আল্লাহকে ভয় করে, যারা ইলমের অধিকারী।'[৯০]

ইবনু মাসঊদ ﷺ বলেন,

لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ ، إِنَّمَا الْعِلْمُ الْخَشْيَةُ

'অনেক হাদীস বলতে পারার নাম ইলম নয়, বরং প্রকৃত ইলম হলো আল্লাহকে

---

[৮৮] ইবনু মাজাহ, ৯২৫
[৮৯] ইবনু মাজাহ, ৩২৭; হাসান
[৯০] সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৮

ভয় করা।'[১১]

তিনি আরও বলেন,

كفى بخشية الله علما وكفى باغترار المرء جهلا

'আল্লাহকে ভয় করাই ইলম হিসেবে যথেষ্ট, আর নিজেকে ধোঁকার মধ্যে রাখা অজ্ঞতা হিসেবে যথেষ্ট।'[১২]

ইলম যদি সালাত কাযা করার অভ্যাস পাল্টাতে না পারে, স্ত্রীর প্রতি হিংস্র হওয়া থেকে বিরত না রাখে, বাবা মায়ের সাথে অসদাচরণ করতে বাধা না দেয়, কিংবা অনলাইনে-অফলাইনে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়, তা হলে এই ইলম আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।

উপকারী ইলম আপনার চরিত্র ও চিন্তা-ভাবনা প্রতিনিয়ত বিশুদ্ধ করবে। আপনাকে সরাসরি উপদেশ দেবে। উপকারী ইলম এমন এক কণ্ঠ, যা কখনও নীরবে বসে থাকে না। সে একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা, বরকতময় পরামর্শদাতা, নিষ্ঠাবান বন্ধু। ব্যক্তির প্রতিটি কাজ সে তদারকি করে, প্রতিক্রিয়ার মুখে লাগাম পড়ায়, সুশৃঙ্খল করে ভালো লাগার বিষয়গুলোকে। আর বিচ্যুতির শুরুতেই বিবেককে জাগ্রত করে তোলে।

আতঙ্কের সময় ইলম তাকে সাহস যোগায়, সন্দেহের ফিতনায় পড়লে মনে বিশ্বাস জোগায়, দুর্বলতার সময় দৃঢ় মনোবল তৈরি করে, আর বিপদের সীমানায় যাবার আগেই চিৎকার করে ডাকে—'সাবধান!'

প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর বড়োত্ব, তাঁর মহিমা, নাম ও গুণসমূহের প্রভাব অন্তরে জাগ্রত রাখে। আল্লাহর পছন্দের বিষয়ের দিকে ব্যক্তিকে টেনে নিয়ে যায় এবং সব ধরনের অপ্রিয় বিষয়সমূহ থেকে টেনে বের করে আনে।

প্রত্যেকবার হারাম পথে পা বাড়াবার আগ মুহূর্তে, হারাম কিছুর দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দেওয়া কিংবা হারাম পথে বিনিয়োগ করার সময় ইলম আল্লাহর ভয় জোগায় অন্তরে। চিৎকার করে ওঠে, তাকে আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জায় ফেলে দেয় এবং সাথে সাথে থামিয়ে দেয়।

এটাই ইলমের আসল মাকসাদ। তলিবে ইলম বা জ্ঞান অন্বেষণকারী এই লক্ষ্যে পৌঁছোতে ব্যর্থ হলে সে এমন চারটি বিষয়ের মধ্যে পড়ে যাবে, যে চারটি বিষয় থেকে রাসূল ﷺ

[১১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৩১
[১২] আদ-দুর্‌রু আল-মানছুর, ৭/২০

আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন। তিনি বলতেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا

> 'হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এমন ইলম থেকে, যার মধ্যে কল্যাণ নেই; এমন অন্তর থেকে, যেখানে তোমার ভয় নেই; এমন নফস থেকে, যা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না; এবং এমন দুআ থেকে, যার উত্তর পাওয়া যায় না।'[৯৩]

যে ব্যক্তি উপরোক্ত চারটি বিষয়ের ফাঁদে পড়ে গেছে, ইলম তাকে উপকার করতে পারে না। তার অন্তর শক্ত হয়ে গেছে, তার আকাঙ্ক্ষা কখনও পূর্ণ হবার নয়। আর তার দুআর জবাব খুব কমই মেলে।

আবদুল আ'লা ﷬-এর কথাগুলো কতই-না সত্য! তিনি বলেন,

> অর্জিত ইলম যাকে কাঁদায় না, সে মূলত উপকারী ইলম থেকেই বঞ্চিত। কেননা আল্লাহ তাআলা আলিমদের গুণ বর্ণনায় বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

> 'নিশ্চয় এর পূর্বে যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন তা পাঠ করা হয় তখন তারা সাজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। আর তারা বলে, "আমাদের রব মহান, পবিত্র; আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।" আর কাঁদতে কাঁদতে তারা (সাজদায়) লুটিয়ে পড়ে এবং (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।' [সূরা ইসরা, ১৭ : ১০৭-১০৯][৯৪]

কঠোর পরিশ্রম এবং চেষ্টা সাধনার ফলে হয়তো আপনার ইলম বৃদ্ধি পাচ্ছে; কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই ইলম কি আপনার অন্তরে আল্লাহভীতি বাড়াচ্ছে? অতীতের আপনি আর আজকের আপনির মধ্যে কতটুকু পার্থক্য ?

---

[৯৩] আহমাদ, ৬৫৬১, সহীহ
[৯৪] সুনান আদ-দারিমি, ২৯৯

২) উপকারী জ্ঞান আমলে উদ্বুদ্ধ করে

ইমাম আহমাদ ﵀ বলেন,

ما كتبتُ حديثاً عن النبي-صلى الله عليه وسلم- إلا وقد عملتُ به

'আমি নবি ﷺ-এর এমন কোনো হাদীস লিখিনি যার ওপর আমল করিনি।'[১৫]

ইমাম আহমাদ ﵀ এর মতো যারা হাজার হাজার হাদীস মুখস্থ করেছেন, তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য এখানেই। তারা প্রত্যেকটি হাদীস ধরে ধরে আমল করতেন।

একদিনের কথা, ইমাম আহমাদ ﵀ জানতে পারলেন রাসূল ﷺ এক দীনারের বিনিময়ে হিজামা করিয়েছেন। হাদীসটি জানতে পেরে তিনিও হিজামা করালেন এবং বিনিময়ে এক দীনার দিলেন। অন্য-এক-দিন তিনি জানতে পারলেন, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালে রাসূল ﷺ তিন দিন গুহায় অবস্থান করেছিলেন; তাই তিনিও তিন দিন গুহায় অবস্থান করলেন।[১৬]

আরেকবার এক তলিবুল ইলম ইমাম আহমাদের বাড়িতে আসে এবং এক রাত অবস্থান করে। তাহাজ্জুদের সময় সে যেন ওজু করতে পারে, সেজন্য ইমাম আহমাদ তার কক্ষে এক বালতি পানি রেখে আসেন। কিন্তু ফজরের সময় ইমাম আহমাদ ﵀ তার কক্ষে গিয়ে দেখেন, বালতির পানি আগের মতোই আছে। এ দেখে তিনি বলেন,

سبحان الله!، رجل يطلب العلم، ولا يكون له ورد بالليل!

'সুবহানাল্লাহ! একজন ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করে, অথচ কিয়ামুল লাইল আদায় করে না!'[১৭]

হাসান বাসরি ﵀ বলেন,

كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يُرى ذلك في بصره ولسانه ويده وصلاته وتخشعه وزهده

'অতীতে যারা ইলম অন্বেষণ করত, ইলমের প্রভাব তাদের চাহনিতে, কথায়, কাজে, সালাতে, বিনয়বনতায় ও দুনিয়া-বিমুখতায় ফুটে উঠত।'[১৮]

---

[১৫] মানাকিবু ইমাম আহমাদ, ২৪৬
[১৬] মানাকিবু ইমাম আহমাদ, ২৪৬
[১৭] মানাকিবু ইমাম আহমাদ, ২৭৩
[১৮] ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ, ৭৯

আবূ কিলাবা ﷺ তাঁর ছাত্র আইয়ূব সিখতিয়ানি ﷺ-কে বলেন,

إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به

'যখন আল্লাহ তোমাকে নতুন কোনো বিষয়ে ইলম দান করেন, তখন তুমি তাকে আমলে রূপ দাও। (আমল ব্যতীত) কেবল ইলম অর্জনকেই তোমার মূল উদ্দেশ্য বানিয়ো না।'[৯৯]

সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা ﷺ বলেন,

إِذَا كَانَ نَهَارِي نَهَارَ سَفِيهٍ ، وَلَيْلِي لَيْلَ جَاهِلٍ ، فَمَا أَصْنَعُ بِالْعِلْمِ الَّذِي كَتَبْتُ ؟

'আমি যদি বেকুবের মতো দিন পার করি, আর মূর্খদের মতো রাত কাটাই, তা হলে যে ইলম আমি লিখেছি, এর মানে কী।'[১০০]

দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমরা এমন অনেক ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যারা জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহ-প্রদর্শন করে। কিন্তু তাদের আচরণ দেখে আমরা তাদের থেকে দূরে সরে যাই। তারা সময়ের খুব কমই কদর করে, গেইমস নিয়ে পড়ে থাকে, মাত্রাতিরিক্ত সামাজিক হয়ে যায় এবং ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা এমন সব বিষয়ে তর্ক করে, যার কোনো গুরুত্বই নেই। কিংবা বাস্তবিক অর্থে কোনো উপকার নেই। আসলে তারা চায়, একমাত্র তাদের মতামতই অগ্রাধিকার পাক। এটাই তাদের মূল বিবেচ্য বিষয়। এজন্যই অবিরাম তর্ক করতে থাকে।

রাসূল ﷺ বলেন,

ما ضلّ قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل

'হিদায়াত পাওয়ার পর কোনো জাতি অত্যধিক বিতর্কের মাধ্যমেই গোমরাহ হয়।'[১০১]

মা'রূফ কারখি ﷺ বলেন,

إذا أراد الله بعبد خيراً فتح له باب العمل، وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرًّا أغلق عنه باب العمل، وفتح له باب الجدل

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তার জন্য আমলের দরজা খুলে দেন এবং তর্কের

[৯৯] ইবনু আব্দিল বার্, জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাদ্বলিহ, ১১৩৪
[১০০] হিলইয়া, ৭/২৭১
[১০১] তিরমিযি, ৩২৫৩, হাসান

দরজা বন্ধ করে দেন। আর আল্লাহ যার অকল্যাণ চান, তার জন্য আমলের দরজা বন্ধ করে দেন এবং তর্কের দরজা খুলে দেন।'[১০২]

তিনি আরও বলেন,

المراء والجدال فى العلم يذهب بنور العلم

'তর্ক-বিতর্ক ইলমের নূর নিভিয়ে দেয়।'[১০৩]

এ ধরণের লোকদের কাছে—ইবাদাত, ইলম অর্জন, দাওয়াতি কাজ যেন বোঝার মতো মনে হয়। তাই লাগামহীন তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত রাখে নিজেদেরকে। যখন সম্মানের কাজকে উপেক্ষা করা হয়, তুচ্ছজ্ঞান করা হয়, তখন লাঞ্ছনার কাজই কপালে জোটে। এটাই আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম। যদিও ব্যক্তি এবং তার সমাজ সেই কাজকে সম্মানজনক মনে করে, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে সে অপদস্থ, পরকালের পাল্লায় ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

৩) উপকারী ইলম বিনয়ের দিকে আহ্বান করে

উপকারী ইলম ব্যক্তিকে সর্বদা নিরাপদ বিষয়ের দিকে আহ্বান করে এবং আখিরাত নিয়ে ফটকাবাজি করা থেকে সাবধান করে। এই ইলমের অধিকারীরা শুধু হারাম থেকেই নয়, বরং সন্দেহজনক বিষয় থেকেও সতর্ক থাকে। বিনয়ের কারণে তারা 'আমি জানি না' বলতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না।

আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলা ﵀ বলেন,

لقد أدركت فى هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أحد منهم يُحَدِّث حديثا إلاَّ وَدَّ أن أخاه كفاه الحديث ، ولا يُسْأل عن فُتيا إلاَّ وَدَّ أن أخاه كَفَاه الفُتيا

'আমি এই মাসজিদে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ১২০ জন আনসারি সাহাবির সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাঁদেরকে কোনো হাদীস বলতে বলা হলে তাঁদের সকলেই আশা করতেন যেন অন্য কেউ সেটা বলে দেয়। তদ্রূপ কোনো ফাতওয়া জানতে চাওয়া হলে আশা করতেন যেন অন্য কেউ সেটার উত্তর দিয়ে দেয়।'[১০৪]

---

[১০২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল-আউলিয়া, ৮/৩৬১
[১০৩] জামিউল উলূম, ১/২৪৮
[১০৪] ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, ১/২৮

ইবনু সীরীন ﷺ-এর ব্যাপারে বলা হয়,

كان ابن سيرين إذا سُئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدّل حتى كأنه ليس بالذى كان

'তাকে হালাল-হারাম বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে (ভয়ে) তার চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে যেত এবং কিছুক্ষণ আগেও তিনি যেমন ছিলেন, সেই অবস্থায় ফিরে যেতে পারতেন না।'[১০৫]

ইমাম মালিক ﷺ-এর ব্যাপারেও বর্ণিত আছে,

لكأنما مالك والله إذا سئل عن مسألة واقف بين الجنة والنار

'মালিক ﷺ-কে যখন কোনো প্রশ্ন করা হতো, তাকে দেখে মনে হতো যেন তিনি জান্নাত-জাহান্নামের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন!'[১০৬]

আতা ইবনু আবী রাবাহ ﷺ বলেন,

أدركتُ أقواماً إنْ كان أحدهم ليُسأل عن الشيء، فيتكلم وإنه ليرعد

'আমি এমন মানুষদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাদের কাউকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জবাব দেবার সময় তারা ভয়ে কাঁপতেন।'[১০৭]

উমাইর ইবনু সাঈদ ﷺ বলেন, 'আমি আলকামা-কে একটি প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, "আবীদাকে জিজ্ঞেস করো।" আমি আবীদার কাছে গেলাম। তিনি বললেন, "আলকামাকে জিজ্ঞেস করো।" আমি বললাম "আলকামা আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।" তিনি বললেন, "তা হলে মাসরূককে জিজ্ঞেস করো।" কাজেই আমি তার নিকট গেলাম। তিনিও বললেন, "আলকামা-কে জিজ্ঞেস করো।" আমি বললাম, "আলকামা-কে আমি জিজ্ঞেস করেছি, তিনি আমাকে আবীদার কাছে পাঠান। আর আবীদা আপনার কাছে পাঠান।" তিনি বললেন, "তা হলে আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলাকে জিজ্ঞেস করো।" তারপর আমি আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলার নিকট গেলে তিনি উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন। ফলে আমি কোনো উপায় না দেখে আলকামার কাছে ফিরে গেলাম। এরপর তিনি আমাকে বলেন,

---

[১০৫] ইবনু রজব, মাজমুআতু রাসাইল, ১/২৩
[১০৬] ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, ৪/১৬৭
[১০৭] ফাতহুল মান্নান, ২/১৩৭

كان يقال: أجرأ القوم على الفُتيا أدناهم علماً

'কথায় আছে—যে জাতি যত দ্রুত ফাতওয়া দেয়, সে-জাতি ততই অজ্ঞ।'[১০৮]

৪) উপকারী ইলম খ্যাতি থেকে পালাতে বাধ্য করে

উপকারী ইলম তালাশকারী ব্যক্তি লোকদের প্রশংসায় অভিভূত হয় না। এর কুপ্রভাব থেকে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। এমন ব্যক্তি বিভিন্ন উপাধির বদলে স্রেফ নিজের নামটুকু ব্যবহার করাকেই পছন্দ করে, এবং পছন্দ করে যেন সেই নামে তাকে ডাকা হয়। সে হারাম কাজের ব্যাপারে তটস্থ থাকে। সে মনে করে, পাহাড়সম আমল ধসিয়ে দিতে অণু পরিমাণ গোনাহই যথেষ্ট। আর তাই ইবনু মুহায়রীয ﷺ বলতেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ذِكْراً خَامِلاً

'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে সাদামাটা প্রশংসাই কামনা করি।'[১০৯]

তারা আল্লাহর কাছে পানাহ চায়, যেন তাদের ওপর খ্যাতির আলো না জ্বলে। কারণ, তারা চায় না সবাই তাদের চিনে নিক।

একদিন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বাইরে বের হলেন। পথিমধ্যে কিছু ভক্ত তাঁর পিছু পিছু হাঁটা ধরল। এ দেখে ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন,

علامَ تتبعوني؟ والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلان

'আমার পিছু নিয়েছ কেন? আল্লাহর কসম, দরজার ওপারে আমি কেমন তা যদি তোমরা জানতে, তা হলে তোমাদের একজনও আমাকে অনুসরণ করতে না।'[১১০]

ইমাম আহমাদ ﷺ-এর চাচা একদিন তাঁর বাড়িতে আসেন। এসে দেখেন, ইমাম আহমাদ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসে আছেন। তাঁকে এতটাই দুর্দশাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল যে, কষ্টে তিনি মাথা নিচু করে ছিলেন। তাঁর চাচা এর কারণ জানতে চাইলে ইমাম আহমাদ ﷺ মাথা তুলে বলেন,

يا عم، طوبى لمن أخمل الله ذكره

[১০৮] ফাতহুল মান্নান, ২/১০৭

[১০৯] হিলইয়া, ৫/১৪০

[১১০] আত-তাওয়াদু' ওয়াল-খুমূল, ৫২

‘চাচাজান, এমন ব্যক্তি কতই-না সৌভাগ্যবান যাকে আল্লাহ তাআলা খ্যাতির বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করেছেন!’[১১১]

তিনি আরও বলতেন,

أريد أن أكون بشِعب بمكة حتى لا أُعرف قد بُليت بالشهرة إنى أتمنى الموت صباحاً ومساءً

‘আমি মক্কার প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকতে চাই, যেখানে কেউ আমাকে চিনবে না। আমি খ্যাতির বিড়ম্বনায় ডুবে আছি। সকাল-সাঁঝে আমি মৃত্যু কামনা করি।’[১১২]

ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﷺ বলেন,

ما صدق الله عبد أحب الشهرة

‘যে ব্যক্তি খ্যাতি পছন্দ করে, সে আল্লাহর প্রতি সৎ নয়।’[১১৩]

আইয়ূব সিখতিয়ানি ﷺ যখন কোনো সমাবেশের সামনে দিয়ে যেতেন এবং সবাইকে সালাম দিতেন, লোকজন তাকে চিনতে পেরে অত্যধিক সম্মানের সাথে জবাব দিত। এ দেখে তিনি বলে উঠতেন,

كأن ذلك نقمة، كأن ذلك نقمة

‘আমাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে! আমাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে!’

আমাদের সালাফরা ভিআইপি টিকেট চাইতেন না, তাঁরা সম্মান আশা করতেন না; প্রথম সারিতে জায়গা, স্পেশাল কেয়ারিং কিংবা সার্ভিস পছন্দ করতেন না। ‘আমি সকলের চেয়ে আলাদা’ এই ধারণা যেন মনে না আসে, সেজন্য তারা সতর্ক থাকতেন। আর তাই সাধারণদের মতো থাকতেই পছন্দ করতেন। তাদের খাবার ছিল সাধারণ, এবং আল্লাহর সত্যিকারের বান্দার মতো তারাও মাটিতে বসতেন।

তাঁরা খ্যাতিকে এতটাই ঘৃণা করতেন যে, খালিদ ইবনু মা'দান ﷺ-এর দরসে মানুষদের উপস্থিতি যখন বেড়ে যেত, তিনি খ্যাতির ভয়ে উঠে যেতেন। তদ্রূপ আবুল আলিয়া ﷺ-এর হালাকায় যখন তিন জনের অধিক শ্রোতা জড়ো হতো, তিনি উঠে যেতেন।

[১১১] ইবনু আসাকির, তারিখু দিমাশক, ৫/৩০৯
[১১২] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১/২১৬
[১১৩] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৭/৭৩

আবূ বকর ইবনু আইয়াস ﵀-কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো,

كم رأيت أكثر ما رأيت عند إبراهيم النخعي؟ قال: "أربعة، خمسة

'ইবরাহীম নাখঈ ﵀-এর দরসে আপনি সর্বোচ্চ কতজন দেখেছেন?' তিনি বলেন, 'চার কী পাঁচ হবে।'

আজকের এই যুগে বিশ, দশ কিংবা পাঁচজন নিয়ে কয়জন শাইখ হালাকার আয়োজন করতে রাজি হবে? এরপর কেউই যদি আলোচনায় মুগ্ধ না হয়, তা হলে তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে?

অনেকের জীবনে সফলতাই নির্ণীত হয় অনুসারীদের সংখ্যা বিবেচনায়। তাদের লেখা কী পরিমাণ শেয়ার হলো, কী পরিমাণ লাইক পেল, ইত্যাদি মানদণ্ডে। বস্তুত আল্লাহ্ যদি আপনার দ্বারা একজন ব্যক্তিকেও উপকৃত করেন, তার জীবন সংশোধন করে দেন, অতঃপর তার দ্বারা অন্যরাও উপকৃত হয়, তা হলে এতটুকুই আপনার জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহর শোকর আদায় করুন তিনি আপনার পাপগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করে দেননি। আপনার অন্তরকে তিনি নিফাক থেকে মুক্ত রাখছেন, এই জন্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করুন। বারবার শোকর আদায় করুন, পানাহ চান, কাঁদুন; যেন হাশরের ময়দানে আপনার কষ্টের নেক আমলগুলো ধূলিকণায় পরিণত না হয়।

এগুলো উপকারী ইলমের কিছু নমুনা। উপকারী ইলম ব্যক্তিকে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়, এবং আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়ে পরিতৃপ্ত রাখে। এই ইলম পাথরের মতো শক্ত অন্তরকেও ভেঙে চুরমার করে দেয়। নিজের দুর্বলতা এবং মৃত্যু-পরবর্তী দীর্ঘ যাত্রার ভয়ে এই জ্ঞান তাকে কাঁদায়। এ হলো কিছু ফিল্টার। জ্ঞানার্জনের পথে আপনি এগুলো ব্যবহার করবেন। যাচাই করে দেখবেন কোন ইলম কতটা উপকারী। যেন যাত্রার শেষ প্রান্তে এসে জান্নাতের দেখা পান। আল্লাহর সন্তুষ্টি পান।

হারাম দরজা

যখন কেউ রিযক তালাশে ক্ষেত্রে হারাম দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, তার জন্য হালাল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটাই বাস্তবতা।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যারাই হারাম উপার্জনের দারস্থ হয়, তাদের অনেকেরই একাধিক ফ্লাট আছে, আয়ের বিভিন্ন উৎস আছে, কারও-বা বিরাট অঙ্কের ব্যাংক ব্যালেন্সও আছে। তবুও সে হারাম পন্থা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। এমন ব্যক্তিদের নিয়ে এ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে—হালাল দরজা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে?

সোনালি যুগের একটি গল্প বলি। একদিন আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ মাসজিদুল কুফায় গেলেন। প্রবেশের সময় এক বালককে তাঁর বাহন (পশু) দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। এরপর আলি ﷺ সালাত শেষ করে বালকটিকে এক দীনার হাদিয়া দেবার মনস্থির করলেন। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে তিনি দেখলেন, বালকটি বসার বাহন নিয়ে পালিয়ে গেছে! অবাক কাণ্ড। তো আলি ﷺ আরেক ব্যক্তিকে দীনারটি দিয়ে অনুরোধ করলেন বাজার থেকে যেন একটি বসার বাহন কিনে আনে।

বাজার ঘুরে সেই লোকটি যে বসার বাহন নিয়ে ফিরে এল, তা দেখে আলি ﷺ এবার আরও অবাক।

- সুবহানাল্লাহ! একি! এটা তো আমারই বাহন!

- কিন্তু আমি তো বাজারে এক বালকের কাছ থেকে এক দীনারের বিনিময়ে কিনে এটি আনলাম!

আলি ﷺ-এর কৌতূহল বেড়ে গেল। বিস্ময়সুরে তিনি বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! আমি তাকে দীনারটি হালালভাবে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে তা হারাম পন্থায় অর্জন করল!

আপনার তাকদীরে যে রিযক আছে তা আপনি পাবেনই। পরীক্ষা নেওয়া হয়, আপনি তা কীভাবে অর্জন করছেন; হালালভাবে না হারামভাবে। ঘুরে-ফিরে রিযক আপনার কাছেই আসবে।

আপনি হারাম-চক্র থেকে বেরিয়ে আসুন। আপনি যদি চান আমি হারাম ছেড়ে দেব, তখন আপনার জন্য হালালের দরজা পুনরায় খোলা হবে। প্রয়োজন শুধু একটি পদক্ষেপ। সেই হারামের দরজাগুলো এমনভাবে বন্ধ করার পদক্ষেপ নিন, যেন সেগুলো আর কখনও খোলা না হয়।

টুকরির বিনিময় প্রাসাদ

একবার এক লোকের গল্প শুনেছিলাম আমাদের এক ভাইয়ের কাছে। সে একটি মাসজিদ নির্মাণের দায়িত্বে ছিল। আসলে পুরো প্রজেক্টটাই তার নিজের। লোকটি এই প্রজেক্টকে সন্তানের চোখে দেখত। মনে-প্রাণে চাইত কিয়ামাতের দিন এটি যেন আল্লাহর সামনে নেক আমল হিসেবে পেশ করতে পারে। সে একজন ধনী মানুষ। তাই এই প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্যে যাবতীয় খরচ নিজেই বহন করল। পাশাপাশি কড়া নজরদারি রাখল—কেউ যেন এই নির্মাণ-কাজে কোনোভাবে অবদান রাখতে না পারে। মূলত এই আমলের সাওয়াব সে একাই পেতে চাচ্ছিল। তাই কারও অংশীদার থাকবে—এটি সে মেনে নিতে পারেনি।

নির্মাণ-কাজ চলাকালে একদিন এক বৃদ্ধা সেখানে যায় একটি টুকরি নিয়ে। সম্ভবত তিনি কারও কাছে শুনেছেন এখানে মাসজিদ নির্মাণ হচ্ছে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে সে কী-বা করতে পারবে! তাই একটি ছোট্ট টুকরি বানিয়ে নিয়ে আসেন। এই আশায়, হয়তো এটি দিয়ে শ্রমিকরা দু-একটা ইট বহন করতে পারবে, তাদের কাজে আসবে।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যখন মাসজিদ নির্মাণ-কাজ সমাপ্ত হলো, মাসজিদ নির্মাতা একটি স্বপ্ন দেখল। সে দেখল, দুটো প্রাসাদ। একটি প্রাসাদ দেখিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কার?' স্বপ্নে তাকে বলা হলো, 'মাসজিদ নির্মাণ-কাজে অবদান রাখার জন্য আল্লাহ তোমাকে এই পুরস্কার দিয়েছেন।'

নির্মাণ-কাজে 'অবদান রাখার জন্য'! সে যেন আকাশ থেকে পড়ল এ কথা শুনে! 'অবদান! এ আমার মাসজিদ। আমি বানালাম। আমার আমল এটি। কেন অবদান বলা হচ্ছে?!' ঘুম ভাঙতেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেল সে। শ্রমিকদের কাছে গিয়ে জানতে চাইল, 'আমি স্বপ্নে এরূপ দেখেছি। সত্যি করে বলো তো, আমার অনুপস্থিতিতে এই মাসজিদের কাজে কেউ কি কোনোভাবে সহায়তা করেছে?'

তারা বলল, 'না তো! কাজটি সম্পূর্ণ আমরাই করেছি।'

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা নিশ্চিত?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ অবশ্যই। শুধু আমরাই করেছি। তবে একদিন এক বৃদ্ধা এখানে একটি টুকরি রেখে যায়, আমরা তা ব্যবহার করেছিলাম। এ ছাড়া কিছুই না।'

লোকটার বুঝতে বাকি রইল না। আল্লাহ অত্যন্ত মহানুভব। সে টুকরিটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বৃদ্ধার বাড়ি খুঁজতে লাগল। খুঁজেও পেল। দরজায় কড়া নাড়তে বৃদ্ধার দেখা পেল সে। এরপর তাকে করজোড়ে অনুরোধ করল, 'প্লিজ আপনার টুকরিটা ফেরত নিন! টুকরিটা ফেরত নিন প্লিজ!'

সে শুরু থেকেই চায়নি কেউ তার সাওয়াবের ভাগিদার হোক। তাই কাকুতি-মিনতি করে বলল, 'প্লিজ আপনার টুকরিটা ফেরত নিন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন।'

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? কী হয়েছে?!' লোকটি জানাল, 'আসলে আমি স্বপ্নে এই এই দেখেছি।' সব শুনে বৃদ্ধা অবাক। বলল, 'সুবহানাল্লাহ! আমিও ঠিক এমন একটি স্বপ্নই দেখেছি। স্বপ্নে আমিও দুটো প্রাসাদ দেখেছি। আমাকেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে, "মাসজিদ নির্মাণ-কাজে অবদান রাখার দরুন আল্লাহ তোমাকে এই পুরষ্কার দিয়েছেন।" আর আমি এই নেক আমল ছাড়া এমন পুরস্কার অর্জন করতে পারতাম না। জাযাকাল্লাহু খাইর।' এই বলে সে টুকরি ফেরত নিতে অস্বীকৃতি জানাল।

আপনি যখন আল্লাহর রাস্তায় দান করেন, তখন আপনি আলি হাম্মুদা, মুহাম্মাদ, জিম... দুনিয়ার কারও সাথে লেনদেন করছেন না; সরাসরি আল্লাহ তাআলার সাথে লেনদেন করছেন। জগৎসমূহের প্রতিপালকের সাথে করছেন। আর আল্লাহর কাছে এটা কোনো বিষয় না আপনি কতটুকু করেছেন। আল্লাহ দানের পরিমাণ নয় বরং মনের নিয়ত দেখেন। আর তাই পুরস্কার তা-ই পাবেন যেমন নিয়ত করবেন। ছোট্ট একটি কাজ নিয়তের ফলে পাহাড়সম পুরস্কারও বয়ে আনতে পারে। অতএব নিয়ত পরিশুদ্ধ করুন। একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যান। এবং অপেক্ষা করুন কল্পনাতীত সাওয়াব দেখার। আল্লাহ দেবেন।

কুরআনের সাথে পথচলা

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

'আসলে এ কুরআন এমন পথ দেখায় যা একেবারেই সোজা।'[১১৪]

আয়াতে 'সবচেয়ে সরল' বোঝাতে আরবি যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা হলো أَقْوَمُ (আকওয়াম)। ইংরেজি ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দটি superlative degree । অর্থাৎ কুরআনের সদৃশ কিছু নেই; এমনকি আংশিক তুলনাযোগ্যও না। কুরআন সবচেয়ে সরল, দৃঢ় ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ দেখায়। তা ছাড়া أَقْوَمُ শব্দটি বিশেষণ। আমরা ছোটোবেলায় পড়ে এসেছি বিশেষণ বা Adjective এর কাজ কোনোকিছুকে বর্ণনা করা। أَقْوَمُ কী বর্ণনা করছে?

আয়াতে উহ্য রাখা হয়েছে বিষয়টি। অর্থাৎ পাঠকের বিবেকের কাছে প্রশ্ন ছেড়ে গেছে : এই কুরআন পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল ও মজবুত... কোন বিষয়ে? পারিবারিক বিষয়ে? স্বাস্থ্য বিষয়ে? না অর্থনৈতিক? বলা হয়নি। তাই আলিমগণ বলেন,

لإثبات عموم الهداية بالقرآن للتي هي أقوم في كلِّ شيء

'কুরআন সকল বিষয়ে সর্বোত্তম সমাধান দেয়—এই দাবি প্রতিষ্ঠিত করতেই বিষয়বস্তু অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে।'

কুরআন শুধু জীবনের ক্ষুদ্র অংশ নিয়েই কথা বলে না। কেবল নির্দিষ্ট প্রজন্মের জন্য কুরআন নাযিল হয়নি। দুনিয়া ও আখিরাতের যে-কোনো সমস্যার সমাধান পাবার নিয়তে কেউ যখন কুরআনের কাছে আসে, কুরআন তখন সর্বোত্তম সমাধান দিয়ে থাকে।

আপনি হয়তো নিজের ওপর কুরআনের প্রভাব দেখতে পাচ্ছেন না, কিংবা সামগ্রিকভাবে

[১১৪] সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ৯

উম্মতের মধ্যে এর কোনো ভূমিকা দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু কুরআনের দাবি—সে সব বিষয়ে সর্বোত্তম সমাধান দেয়। তা হলে সমাধানের প্রভাব দেখা যাচ্ছে না কেন? দুটোর একটি হবে : হয় কুরআন তার দাবি অনুযায়ী সঠিক পথ দেখায় না; নাউযুবিল্লাহ! নয়তো আমরা কুরআনকে ঠিকভাবে মানতে ব্যর্থ হয়েছি, তাই সঠিক পথ পাচ্ছি না।

হ্যাঁ, দ্বিতীয় কারণটাই আসল সমস্যা। তা হলে আরেকটি প্রশ্ন আসে, কখন এই কুরআন ব্যক্তি থেকে শুরু করে গোটা উম্মাহর সংশোধন করবে?

এর উত্তরে বলব, 'যখন কুরআনের সাথে আমাদের আচরণ ইনসাফপূর্ণ হবে।' পথহারা মরু-পথিকের কথাই চিন্তা করুন। প্রতিটি মুহূর্ত তাকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে। আচমকা সে একটি ম্যাপ পেয়ে গেল, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কীভাবে দ্রুত এবং নিরাপদে মরুভূমি থেকে বের হতে পারবে। ভাবুন, সেই মুহূর্তে তার অনুভূতি কেমন হবে! কল্পনা করুন, তখন তার চোখযুগল কতটা ঝলমলে দেখাবে! তার ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহের কথা ভাবুন, সে দেখছে, বারবার দেখছে ম্যাপটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আশায় বুক বাঁধছে, এবার সে রেহাই পাবে, মুক্তি পাবে...

কুরআন পড়ার সময় আমাদেরও এরকম অনুভূতি কাজ করা উচিত। এটি আমাদের সর্বোত্তম পথ দেখাবে, নিরাপদে কূলে ফিরিয়ে আনবে। কুরআনের সাথে আমাদের আচরণ এমনই হওয়া কাম্য।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

'যাদের হৃদয় আছে কিংবা যারা একাগ্রচিত্তে কথা শোনে তাদের জন্য এ ইতিহাসে অনেক শিক্ষা রয়েছে।'[১১৫]

আরেক স্থানে বলেন,

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا ٱلْقَوْلَ

'তারা কি এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না?'[১১৬]

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? না তাদের অন্তরসমূহে তালা

[১১৫] সূরা ক্বফ, ৫০ : ৩৭
[১১৬] সূরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ৬৮

লেগে গেছে?'[১১৭]

আরবিতে তালা শব্দটির একবচন হলো قفل (কুফ্ল) আর বহুবচন হলো أَقْفَالُ (আকফাল)। কুরআনে শব্দটি বহুবচন রূপে এসেছে। যার অর্থ একাধিক তালা।

আল্লাহ বলেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

'আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।'[১১৮]

কম-বেশি প্রত্যেক মা-বাবারই আশা থাকে সন্তান হাফিয হবে। নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় বিষয়। কিন্তু আপনি এমন অভিভাবক খুব কমই পাবেন, যারা সন্তানকে কুরআন বোঝানোর জন্য শিক্ষক খোঁজ করছেন। আসলে, আল্লাহ তাআলা এই উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেছেন, যেন আমরা বুঝি, এর শিক্ষা বাস্তবায়ন করি।

কুরআনি জাতি গড়ার শুরুতেই প্রয়োজন হলো কুরআনকে তার প্রাপ্য অধিকার দেওয়া। আয়াতের শিক্ষাগুলোর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া।

ভূমিকার এই পর্যায়ে এসে আমরা একটি প্রশ্ন করব, তাদাব্বুর (চিন্তা-ভাবনা) এবং তাফসীর (ব্যাখ্যা করা)—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

তাফসীর এবং তাদাব্বুরের মধ্যে পার্থক্য

তাদাব্বুর শব্দটির বুৎপত্তিগতভাবে 'দুবুর' থেকে এসেছে। এর অর্থ مؤخرة الشيء কোনোকিছুর পেছন দিক বা অভ্যন্তরীণ অবস্থা। অর্থাৎ তাদাব্বুর বলতে বোঝায় النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه 'বিষয়সমূহের ফলাফল এবং পরিণতির দিকে মনোনিবেশ করা।'

সহজ বাংলায় 'তাদাব্বুর করা' মানে আয়াতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। জানা ও মানার উদ্দেশ্য নিয়ে পড়া। তাদাব্বুর শুধুমাত্র নেক আমলের দিকেই ধাবিত করে না, বরং বিষয়টির সাথে আরও অনেককিছু জড়িয়ে আছে। অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিশা পেতে, কপটতা ছেড়ে আন্তরিক হওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা অন্ধকার থেকে

[১১৭] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৪
[১১৮] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ২৯

আলোতে ফিরে আসার জন্য তাদাব্বুর সহায়ক হতে পারে। তিলাওয়াত করার সময় মনকে যদি এগুলোর কোনো একটিতে নিবদ্ধ করা যায়, ব্যক্তি তখনই তাদাব্বুরের পথে চলতে শুরু করবে। সত্যি বলতে তখনই সে আল্লাহর এই নির্দেশটি বাস্তবায়ন করতে পারবে :

'আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।'[১১৯]

তা হলে তাফসীর কী?

তাফসীর শব্দটি এসেছে 'আল-ফাসর' থেকে, যার অর্থ 'আল-কাশফ' অর্থাৎ উন্মোচন করা।

যুরকানি তাফসীর শব্দকে সংজ্ঞায়িত করেছেন :

علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

'এমন একটি জ্ঞান, যা দ্বারা ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী কুরআনে আল্লাহর উদ্দিষ্ট অর্থ বোঝার চেষ্টা করা হয়।'[১২০]

অর্থাৎ একজন মুফাসসিরের দায়িত্ব আয়াতের উদ্দিষ্ট অর্থ উন্মোচন করা। অতএব আমরা বলতে পারি, তাফসীর হচ্ছে তাদাব্বুরের দরজা। সর্বপ্রথম পাঠককে উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝতে হবে, এরপর পাঠক তাদাব্বুর করবে। অর্থাৎ আয়াতের মণিমুক্তা-হিকমত-লক্ষ্য-মর্ম-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করবে।

তাফসীর এবং তাদাব্বুরের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে, তাফসীর করার দায়িত্ব আলিমদের। কারণ, আরবি ভাষায় তাদের পাণ্ডিত্য আছে। অপরিহার্য অন্যান্য বিষয়গুলোতে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন তারা। পক্ষান্তরে তাদাব্বুর বা চিন্তা-ভাবনা করার দায়িত্ব গোটা উম্মতের। মজার বিষয় দেখুন, যে দুই আয়াতে আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন, 'তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না?' অর্থাৎ ৪নং সূরা ও ৪৭ নং সূরা, উভয় আয়াতেই তিনি প্রশ্নটি ছুড়ে দিয়েছেন কাফিরদের দিকে!

তৃতীয় পার্থক্য হলো, তাফসীরের সীমা আছে, আর তাদাব্বুরের কোনো সীমা-পরিসীমা

[১১৯] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ২৯
[১২০] মানাহিলুল ইরফান, ২/১৩৩

নেই। বরং তাদাব্বুর চলাকালে আল্লাহ হয়তো কারও মনে এমন কিছু ঢেলে দিতে পারেন, যা ইতিপূর্বে কারও অন্তরেই আসেনি।

তাদাব্বুরের পূর্বশর্ত

তাদাব্বুর বা চিন্তা-ভাবনার বিষয়টা ডুবুরিদের মতো। সমুদ্রে ডুবুরিরা কে কত গভীরে যেতে পারে—এটা নির্ভর করে তাদের চর্চার ওপর। চর্চাভেদে ভিন্নতা দেখা দেয়। তদ্রূপ তাদাব্বুরেও মানুষের ভিন্নতা থাকে। আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য, প্রতিটি সূরা ও আয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান, আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট জানা, অলঙ্কারশাস্ত্র, সিদ্ধান্তে যাবার দৃঢ়তা ইত্যাদি জ্ঞানভেদে তাদাব্বুরের মাত্রাও বিভিন্ন রকম হয়।

তবে তাদাব্বুরের মৌলিক কিছু শর্ত আছে, যেগুলো আলিম ও সাধারণ পাঠক—সবার জন্য প্রযোজ্য এবং জরুরিও। সেই শর্তগুলো পূরণের দ্বারা পাঠক তাদাব্বুরের অকৃত্রিম স্বাদ উপভোগ করতে পারবে। আসুন সেগুলো জেনে নিই :

১) কুরআনকে যথোপযুক্ত সম্মান করা, এর পবিত্রতা অনুধাবন করা

কোন বিষয়ে কতটুকু মনোযোগ দিচ্ছেন—নির্ভর করে ওই বিষয়টি আপনার দৃষ্টিতে কতখানি গুরুত্ব বহন করে। অর্থাৎ সকল শর্তের প্রধান শর্ত এটাই। এর ওপরেই নির্ভর করে তাদাব্বুরের ফলাফল। কুরআনের সম্মান অনুধাবনে যদি আমাদের ত্রুটি থাকে, তা হলে আমাদের তাদাব্বুরেও ত্রুটি থাকবে।

আলি ইবনু আবী তালিব ﵁ কুরআনের সম্মানে কী বলেছেন দেখুন,

كِتَابُ اللّٰهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ هُوَ الَّذِى مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّٰهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللّٰهُ فَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ الَّذِى لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِى عَجَائِبُهُ وَهُوَ الَّذِى لَمْ يَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ أَنْ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا هُوَ الَّذِى مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِىَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

‘এ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। এতে রয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ঘটনা, আর পরবর্তীদের

বার্তা। ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে ফয়সালাকারী। তবে এতে ঠাট্টা রসিকতার স্থান নেই। যে এই কুরআন অহংকারবশত পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন। যে একে ছেড়ে ভিন্ন কিছুতে পথনির্দেশ তালাশ করে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। এ হচ্ছে আল্লাহর রশি। বড়োই মজবুত এই রশি। প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ, যা শুধু সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাকে। কোনো অন্তর এর সান্নিধ্যে এসে দিশেহারা হয় না। কোনো জিহ্বার পদস্খলন ঘটে না এর উচ্চারণে। কোনো আলিম এর ব্যাখ্যা লিখে তৃপ্ত হন না। সুস্থ অন্তর এর তিলাওয়াত করে কখনোই পরিশ্রান্ত হয় না। এর বিস্ময় কখনও কাটবার নয়। এ হচ্ছে সেই কিতাব যা শুনে জিনেরা বলতে বাধ্য হয়েছিল, 'নিশ্চয়ই আমরা শুনেছি এক বিস্ময়কর কুরআন!'[১২১] এ হচ্ছে সেই কিতাব, যে বক্তা এর থেকে কিছু বলল, সে সত্য বলল। যে এর দ্বারা বিচার করল, সে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করল। যে এর ওপর আমল করল, সে পুরস্কৃত হলো। আর যে এর দিকে আহ্বান করল, সে সীরাতে মুস্তাকীম পেল।"[১২২]

এক হাদীসে রাসূল ﷺ আমাদের জানিয়েছেন, অতীতের কোনো-এক সময়ে একজন রাখাল এক নেকড়েকে মানুষের মতো কথা বলতে দেখে। এতে রাখাল ভারি অবাক হয়, কিন্তু নেকড়ে রাখালের এই বিস্ময় ভেঙে দিয়ে বলে :

أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ؟ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَثْرِبَ يُخْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ

'আমি কি তোমাকে এর চেয়ে বিস্ময়কর কথা বলব না? মুহাম্মাদ ﷺ মদীনায় মানুষদের অতীতে ঘটে-যাওয়া অনেক বিষয় সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছেন!'[১২৩]

যে কুরআন আমার-আপনার ঘরে আছে, এটি এই জগতের নয়। চিন্তা করুন, আপনি যা পড়ছেন, তার প্রতিটি অক্ষর সাত আসমানের মালিকের! এই কথা কোনো মানবের নয়! সত্যিই, এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কী হতে পারে? এ এমন এক গ্রন্থ যা পূর্বে-ঘটিত-বিষয় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে, এবং আগামীতে যা ঘটতে যাচ্ছে, সে বিষয়গুলোও জানিয়ে দেয়। তা ছাড়া কুরআন শুধু নির্দিষ্ট যুগের জন্য নাযিল হয়নি, বরং কিয়ামাত অবধি সকল যুগের ও প্রজন্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নেকড়ের ভাষায়, এটাই সবচেয়ে বিস্ময়ের।

ঘটনাটি আমরা অনেকেই জানি, একদল জিন একবার রাসূল ﷺ-কে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনল। অদৃশ্যে বসে তারা যে কুরআন শুনে যাচ্ছে, নবিজি ﷺ এ

[১২১] সূরা জিন, ৭২ : ১
[১২২] তিরমিযি, ২৯০৬
[১২৩] মুসনাদ আহমাদ, ১১৬২২

ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীকালে আল্লাহ তাকে জিনদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আয়াত নাযিল করেন,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

"(মুহাম্মাদ) বলো, আমার প্রতি ওহি করা হয়েছে যে, নিশ্চয় জিনদের একটি দল মনোযোগ-সহকারে শুনেছে। অতঃপর বলেছে, "আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।""[১২৪]

মানুষের মতো কথা বলতে পারে এমন প্রাণীদের নিয়ে কেউ যখন গল্প করে, কিংবা ভুতুরে জিনদের সাক্ষাতের কাহিনি শোনায়, তখন আমরা কতই-না মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনি! অথচ সেই জিনদের কাছেই সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল আল-কুরআন। হ্যাঁ, এই কুরআনই সবচেয়ে বিস্ময়ের দাবি রাখে। আর এই বিস্ময়ের প্রভাব যদি আমাদের প্রত্যহ জীবনে না মেলে, কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক উন্নত না করে, তা হলে বুঝতে হবে আমরা সত্যিকারার্থে কুরআনের বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি। এর মর্যাদা প্রকৃত অর্থে আমাদের অন্তরে খুব একটা জায়গা করে নিতে পারেনি। অথচ এ কিতাব যদি পাহাড়ের ওপর নাযিল হতো, তা হলে পাহাড় ধসে পড়ত।

আহমাদ ইবনু আবী হাওয়ারি ﷺ বিস্ময়-সুরে বলেন,

إِنِّي لَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَنْظُرُ فِي آيَةٍ آيَةٍ فَيَحَارُ عَقْلِي فِيهَا ، وَأَعْجَبُ مِنْ حُفَّاظِ الْقُرْآنِ ، كَيْفَ يُهْنِيهِمُ النَّوْمُ وَيُسِيغُهُمْ أَنْ يَشْتَغِلُوا بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا ، وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ كَلَامَ الرَّحْمَنِ أَمَا لَوْ فَهِمُوا مَا يَتْلُونَ وَعَرَفُوا حَقَّهُ وَتَلَذَّذُوا بِهِ وَاسْتَحَلُّوا الْمُنَاجَاةَ لَذَهَبَ عَنْهُمُ النَّوْمُ فَرَحًا بِمَا رُزِقُوا وَوُفِّقُوا

'আমি যখন কুরআন পড়তে গিয়ে একের-পর-এক আয়াতের দিকে তাকাই, হতবুদ্ধি হয়ে যাই! হাফিজদের কথা ভেবে যারপরনাই অবাক হই! কীভাবে তারা রাত্রে ঘুমাতে পারে! কীভাবে তারা দুনিয়ার কোনো কাজ নিয়ে ব্যস্ত হতে পারে! দয়াময় আল্লাহর যে কালাম তারা তিলাওয়াত করে, এর অর্থ যদি বুঝত, তা হলে এর হক জানতে পারত; এর মধ্যে প্রশান্তি খুঁজে পেত। আর এর দ্বারা আল্লাহকে ডাকার মধ্যে যে কী আনন্দ, তা যদি অনুধাবন করতে পারত, তা হলে আনন্দের আতিশয্যেই তারা নির্ঘুম কাটিয়ে দিত সারা রাত; এই ভেবে—

[১২৪] সূরা জিন, ৭২ : ১

কত বড়ো নিয়ামাত তারা লাভ করেছে!'[১২৫]

সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন,

"ليتني كنت اقتصرت على القرآن"

'হায়, আমি যদি শুধু কুরআনের সাথে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতাম!'[১২৬]

যে-কেউ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর রেখে-যাওয়া কাজসমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করবে, সে একটাই কথা বলবে, رجل قرآني অর্থাৎ 'এ যেন এক কুরআনীয় মানব!'

তিনি ছিলেন কুরআনের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তাঁর পুরো জীবন কেটেছে এই কালাম বোঝার পেছনে। কুরআন নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকতেন যে, বিয়ে করার সময়টুকু পাননি এই মহান ইমাম।

বরং জীবনেও কুরআন দেখেনি—এরকম কাউকে যদি ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর কাজ দ্বারা কুরআনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়, সে যখন দেখবে ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ 'আল্লাহ বলেছেন' 'আল্লাহ বলেছেন' কতবার পুনরাবৃত্তি করেছেন—লোকটা ধরে নেবে কুরআন হয়তো ১০ খণ্ডের বিশাল কিতাব!

স্বাভাবিক সময়ে ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ প্রতি দশ দিনে এক খতম দিতেন। কিন্তু তাঁকে যখন কারাবন্দি করা হলে, তিনি তিলাওয়াতের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেন। তিন দিনে এক খতম দেওয়া শুরু করেন।

কারাগারের চার-দেওয়ালে বন্দি থেকে এভাবে খতম দিয়ে ফেললেন ৮০ বার! তারপর ৮১তম খতম-চলা-অবস্থায় আল্লাহর ডাক চলে এল। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি এই আয়াত দুটো পড়ছিলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۝ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

'নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বাগ-বাগিচা ও ঝরনাধারার মধ্যে। যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহাঅধিপতির নিকটে।'[১২৭]

কেন আমি এগুলো বলছি? তাক লাগিয়ে দেবার মতো বিষয় হলো, জীবনের শেষ সময়ে তাঁকে বলতে শোনা গেছে :

---

[১২৫] হিলইয়া, ১০/২২

[১২৬] আহমাদ, আল ইলালু ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল, ১০৮৩

[১২৭] সূরা আল-কমার, ৫৪ : ৫৪-৫৫

وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن

'আমার আফসোস হয় সেই অগণিত সময়ের কথা ভেবে, যা আমি কুরআনের অর্থ না বোঝে নষ্ট করেছি।'[১২৮]

মালিক ইবনু দীনার ﷺ বলেন,

أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه

'আল্লাহর কসম করে তোমাদেরকে বলছি, কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে এমন বান্দার অন্তর অবশ্যই এর দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। (নয়তো তার ঈমান সঠিক নয়)।'[১২৯]

সত্যিই, এই কথাগুলো যে মাথায় রাখে এবং যে রাখে না, তিলাওয়াতের সময় উভয়ের অনুভূতি কক্ষনও এক হবে না।

২) বিশ্বাস রাখুন, কুরআন আপনার সাথেই কথা বলছে

চিঠির শুরুতে 'প্রিয় প্রজা' আর 'প্রিয় আবদুল্লাহ' শব্দ দুটোর পার্থক্য ব্যাপক। তা ছাড়া চিঠির গুরুত্ব প্রেরকের মর্যাদার ওপরেও নির্ভর করে। আর এই কারণে সকল নবি-রাসূল সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন আপন জাতিকে বোঝাতে, যে ওহি নিয়ে তারা এসেছেন তা রাজাধিরাজের পক্ষ থেকে এসেছে। বিশ্বজগতের প্রতিপালক—আল্লাহ তাআলার নিকট হতে।

নূহ ও হূদ ﷺ-দুজনই তাদের জাতিকে বলেছেন,

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي

'আমি তোমাদের নিকট আমার রবের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি...'[১৩০]

হাসান বাসরি ﷺ বলেন,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَأَوُا الْقُرْآنَ رَسَائِلَ مِنْ رَبِّهِمْ

'তোমাদের পূর্ববর্তীরা কুরআনকে তাদের রবের-পক্ষ-থেকে-আসা-বার্তা

---

[১২৮] মানহাজু ইবনি তাইমিয়্যা, ৯০
[১২৯] মাজমূ' রাসাঈল, ১/২৯৮
[১৩০] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৬২

(মেসেজ) হিসেবে দেখত।'[১০১]

ইমাম গাযালি ﷺ বলেন,

أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب فى القرآن فإن سمع أمراً أو نهياً قدر أنه المنهى والمأمور وإن سمع وعداً أو وعيداً فكمثل ذلك، وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود وإنما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعيفه ما يحتاج إليه

'(তাদাব্বুরের স্বাদ পেতে) ব্যক্তিকে অবশ্যই বুঝতে হবে, কুরআনে বর্ণিত যাবতীয় কথা তাকেই উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে। তা হলে সে যখন কোনো নির্দেশ কিংবা নিষেধাজ্ঞা শুনবে, তখন বুঝতে পারবে, তাকেই আদেশ ও নিষেধ করা হচ্ছে। যখন কোনো ওয়াদা কিংবা ধমক শুনবে, তখনও তার অনুরূপ অভিব্যক্তি হবে। সে যদি পূর্ববর্তী নবিদের ঘটনা শোনে, তা হলে বুঝবে এগুলো স্রেফ উপভোগ করার জন্য বলা হয়নি। বরং আসল উদ্দেশ্য হলো এসব থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ গ্রহণ করা।'[১০২]

৩) অন্তরকে প্রস্তুত করুন

আলোর প্রভাব চোখে পড়ে আর শব্দের প্রভাব কানে। তেমনি কুরআনের প্রভাব পড়ে অন্তরে। এজন্য আল্লাহ তাআলা মানব-অন্তরকে বেছে নিয়েছেন তাঁর কালাম নাযিলের জন্য। একে নাযিল করেছেন সর্বশেষ নবি, শ্রেষ্ঠ মানব, পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী রাসূল ﷺ-এর অন্তরে।

আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ

'আর নিশ্চয় এ কুরআন রব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত। একে নিয়ে আমানতদার রূহ অবতরণ করেছে তোমার অন্তরে...'[১০৩]

আমরা জেনেছি, কুরআনের প্রভাব ব্যক্তিভেদে রকমারি ধরনের হয়। এজন্যই কুরআনের মতো মহান উপহার নাযিলের পূর্বে আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-এর অন্তর প্রস্তুত করে

[১০১] আল-মাজমূ' শারহ আল-মুহাযাব, ২/১৬৯
[১০২] গাযালি, ইহইয়াউ উলুম-আদ-দ্বীন, ১/২৮৫
[১০৩] সূরা আশ-শুআরা, ২৬ : ১৯২-১৯৪

নিয়েছেন। সীরাতের গ্রন্থে আমরা পড়েছি, শিশুবয়সে দুজন ফেরেশতা রাসূল ﷺ-এর বক্ষ বিদীর্ণ করেছিল। তাঁর অন্তর বের করে এবং এর কলুষতা পরিষ্কার করে পুনরায় স্থাপন করে দেয় তারা। নবিজির জীবনে এটি ঘটেছিল দুবার।

আসলে কুরআনের জন্য অন্তরকে প্রস্তুত করতে হয়। এক্ষেত্রে আমরাও ব্যতিক্রম নই। অন্তরের পরিশুদ্ধি প্রয়োজন। যেন অন্তরের জমিনে কুরআন জন্ম দেয় ঈমানের উৎকৃষ্ট ফলফলাদি।

দুনিয়ার সবচেয়ে স্বচ্ছ পানিও যদি অপরিষ্কার পাত্রে রাখা হয়, পানি নষ্ট হয়ে যাবে। তার বিশুদ্ধতা বজায় থাকবে না। এইটাই বাস্তবতা।

এজন্য যারকাশি ؒ বলেন,

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلنَّاظِرِ فَهْمُ مَعَانِي الْوَحْيِ حَقِيقَةً وَلَا يَظْهَرُ لَهُ أَسْرَارُ الْعِلْمِ مِنْ غَيْبِ الْمَعْرِفَةِ وَفِي قَلْبِهِ بِدْعَةٌ أَوْ إِصْرَارٌ عَلَى ذَنْبٍ

'জেনে রাখো, কোনো ব্যক্তির অন্তর যদি বিদআত কিংবা অনবরত পাপের কালিমা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তবে সে কখনোই ওহির আসল মর্ম অনুধাবন করতে পারবে না, গায়েবি ইলমের গোপন ভাণ্ডার তার সম্মুখে উন্মোচিত হবে না।'[১৩৪]

কুরআনের আলোয় জীবন আলোকিত করার এই যাত্রা আপনার কাছে বারবার কঠিন ঠেকলে বুঝতে হবে—আপনার অন্তরে এমন কিছু পাচিল তৈরি হয়েছে, যা কুরআন প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক। ফলে অন্তর কুরআনের গোপন ভাণ্ডার গ্রহণ করতে পারছে না। আর এই প্রাচীরগুলো ধ্বংসের উপায় একটাই—তাওবা।

৪) তারতীল বা ধীরেসুস্থে কুরআন তিলাওয়াত করুন, তাড়াহুড়ো ছাড়ুন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

'আর এ কুরআনকে আমি সামান্য সামান্য করে নাযিল করেছি, যাতে তুমি থেমে থেমে তা লোকদেরকে শুনিয়ে দাও এবং তাকে আমি (বিভিন্ন সময়) পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।'[১৩৫]

---

[১৩৪] আল-বুরহান ফি উলুমিল-কুরআন, ২/১৮০
[১৩৫] সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ১০৬

আয়াতটির ব্যাখ্যায় তাবিয়ি মুজাহিদ ﷺ বলেন,

لتقرأه على الناس على تُؤَدة، فترتله وتبينه، ولا تعجل في تلاوته، فلا يفهم عنك

'(আমি সামান্য সামান্য করে নাযিল করেছি) যেন তুমি মানুষদের ধীরেসুস্থে ও স্পষ্টভাবে তিলাওয়াত করে শোনাও। তিলাওয়াতে তাড়াহুড়ো করবে না। নয়তো মানুষ বুঝবে না।'[১০৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

'... কুরআন পড়ার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন কোরো না, যতক্ষণ না তোমার প্রতি তার ওহি পূর্ণ হয়ে যায় এবং দুআ করো, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে আরও জ্ঞান দান করো।'[১০৭]

ধীরেসুস্থে পড়া এবং জ্ঞানের প্রবৃদ্ধি—দুটো বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অপরটি অর্জন অসম্ভব ব্যাপার।

৫) হারিয়ে যান কুরআনের জগতে

কোনোকিছুর গভীরে যাবার অন্যতম উপায় হলো, সে বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করা। কথায় আছে ما تكرر تقرر 'যা বারবার করা হয়, তা অন্তরে গেঁথে যায়।' পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ১৭ বার সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে বলার পেছনে হয়তো এটাই গোপন রহস্য। এই সূরা আল্লাহর প্রতি আমাদের দাসত্ব নবায়ন করে। নবায়ন করে আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেই সাথে পৌঁছে দেয় ঈমানের দরিয়ায়।

সূরা ইখলাসের কথাই ভাবুন, প্রত্যেক ফরজ সালাত শেষে আমরা তিলাওয়াত করি এবং মাসনুন দুআ হিসেবে সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে তিলাওয়াত করি। আবার ফজরের দুই রাকআত সুন্নাহ সালাতের দ্বিতীয় রাকাতে, বিতর সালাতের শেষ রাকাতে পড়ি, এবং ঘুমানোর আগে। (কারণ, এগুলো রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ) এতবার সূরা ইখলাস আমরা একদিনেই পড়ি! এখন কেউ যদি প্রতিবার ধীরে ধীরে পড়ে এবং আয়াতগুলো নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে, তা হলে শুধু আমলে আন্তরিকতাই বৃদ্ধি পাবে না, অন্তরেও গেঁথে যাবে।

---

[১০৬] তাফসীর আত-তাবারি, ১৫/১১৬

[১০৭] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১১৪

সূরা আর-রহমানের একটি আয়াতের দিকে তাকান :

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

'অতএব (হে জিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামাত অস্বীকার করবে?'

এই আয়াতটি একবার দুবার নয়, তিরিশ বারেরও বেশি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অথচ সূরা আর-রহমানের মোট আয়াত সংখ্যা মাত্র ৭৮!

বারবার তিলাওয়াতের ফলে অন্তরে আয়াতটি গেঁথে যায়; আয়াতের বাক্য-অর্থ-মর্ম-শিক্ষা, সবকিছু অন্তরে বদ্ধমূল করার কার্যকরী পদ্ধতি এটি। আমাদের পূর্ববর্তীগণ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, আর তাই জীবনভর তাঁরা এভাবেই তিলাওয়াত করেছেন। এমনকি আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ নিজেও কখনও কখনও সারা রাত সালাতে কাটিয়ে দিতেন একটি আয়াত দিয়ে। যেমন :

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে তারা আপনারই বান্দা, আর তাদেরকে যদি ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[১৩৮]

সাহাবি তামীম আদ-দারি ﵁-ও সারা রাত একটি আয়াত পড়ে কাটিয়ে দিতেন। সামনে আগাতে পারতেন না :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

'যেসব লোক অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে তারা কি মনে করে, আমি তাদেরকে এবং মু'মিন ও সৎকর্মশীলদেরকে সমপর্যায়ভুক্ত করে দেব, যেন তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যায়? তারা যে ফয়সালা করে তা অত্যন্ত জঘন্য।'[১৩৯]

সাঈদ ইবনু যুবাইর ﵀ এই আয়াত বারবার পড়তেন :

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

'ওহে মানবসকল, কীসে তোমাকে তোমার মহান রবের ব্যাপারে ধোঁকাগ্রস্ত

[১৩৮] সূরা আল-মাইদা, ৫ : ১১৮
[১৩৯] সূরা আল-জাসিয়া, ৪৫ : ২১

করল?'[১৪০]

ইমাম আবূ হানিফা ﷺ-ও একটি আয়াত দিয়ে গোটা রাত পার করে দিতেন, বারবার পড়তেন, গভীর চিন্তায় হারিয়ে যেতেন। আয়াতটি হলো :

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

'... আর আল্লাহর কাছে থেকে তাদের জন্য এমন-কিছু প্রকাশিত হবে, যা তারা কখনও কল্পনাও করত না।'[১৪১]

সবশেষে নিম্নোক্ত দুটো বিষয়কে শারীআ আলাদা গুরুত্ব দিয়েছে, যখন দুটো একসাথে আসে :

১. কুরআন তিলাওয়াত করা

২. একে অপরকে শেখানো

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ , وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَه

'আল্লাহর ঘরে যখন একদল মানুষ একত্র হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং একে অপরকে শিক্ষা দেয়, তখন তাদের ওপর অবশ্যই প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। রহমত তাদের আচ্ছাদন করে রাখে। এবং ফেরেস্তাগণ তাদের ঘিরে রাখে। আর আল্লাহ্ তাদের নিয়ে আলোচনা করেন তাঁর সাথে যারা আছে।'[১৪২]

দ্বিতীয় বাক্যটি খেয়াল করুন—'এবং একে অপরকে শিক্ষা দেয়।' অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনার ফলাফল একে অপরের সাথে শেয়ার করে। তাদাব্বুরের ফলে যে গোপন রহস্য তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠেছে, অন্যদের তা শেখায়।

কুরআনের এই ধরণের বৈঠক আল্লাহর নিকট জগতের সর্বোত্তম বৈঠক। সপ্তাহে অন্তত এক ঘণ্টার জন্য হলেও এরকম বৈঠকের ব্যবস্থা করুন; বিজ্ঞ আলিম কিংবা বড়ো মাপের কোনো ব্যক্তির সাথে করতে হবে—ব্যাপারটা এমন নয়। পরিবারের সদস্যদের নিয়েই শুরু করুন। সেখানে আপনারা কুরআন থেকে অংশ বিশেষ পড়বেন, একে অপরের

[১৪০] সূরা আল-ইনফিতার, ৮২ : ৬
[১৪১] সূরা আয-যুমার, ৩৯ : ৪৭
[১৪২] মুসলিম, ১০২৩/৯

তিলাওয়াত শুধরে দেবেন। সেই সাথে গ্রহণযোগ্য কোনো তাফসীর-গ্রন্থ থেকেও পড়ে শোনাবেন; যেমন তাফসীর আস-সা'দী। এরপর চিন্তার জগতে হারিয়ে যাবেন সবাই একসাথে। একে অপরের তাদাব্বুর-থেকে-প্রাপ্ত শিক্ষা শেয়ার করবেন। এভাবে আয়াতের হিকমতগুলো বের করে আনুন, আপনার সন্তানকেও অনুপ্রাণিত করুন, পুরস্কারের ব্যবস্থাও রাখুন। এভাবে প্রতি সপ্তাহে বসুন। এরপর দেখবেন কত বরকত যে লাভ হয় এই ধরণের বৈঠক থেকে, তা গুণে শেষ করতে পারবেন না। অতীতে কল্পনাও করেননি আপনি।

মাদরাসাপড়ুয়া ভাই-বোনদেরকেও আমি একই কথা বলব। জীবনে যতই ব্যস্ততা থাকুক, দ্বীনের রাহে নিবেদিত কিছু বন্ধু তালাশ করো। তাদের নিয়ে সপ্তাহে একবার হলেও বসো এবং কুরআনের কোনো-একটি সূরা ধরে একসাথে সেই সমুদ্রে ডুব দাও। এর গুপ্ত ভাণ্ডার জাতির সামনে তুলে আনো তোমরা। রোজনামচায় সেই শিক্ষাগুলো টুকে রাখো।

প্রবৃত্তির খায়েশকে লাগাম পরাতে এই বৈঠকগুলো শুধু উপকারীই নয়, অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। সংশয়ের এই যুগে আমাদের ঈমান ও দ্বীনের বাঁধন মজবুত করবে। মুছে দেবে পাপের কালিমা, আলোকিত করবে অন্ধকার কবর, এবং পৌঁছে দেবে জান্নাতের চূড়ায় ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহর সাথে কথা বলতে

আজ অবধি কয়টি রমাদান চলে যেতে দেখলেন? ৫, ১০, ২০... কারও জীবনে সংখ্যাটি হয়তো আরও বেশি। কিন্তু এখনও আপনি বুঝে উঠতে পারেননি তারাবিতে কী তিলাওয়াত করা হয়। নিজেকে প্রশ্ন করুন,

জীবন থেকে আর কয়টা রমাদান চলে গেলে আমার পরিবর্তন আসবে?

নিজেকে বদলে ফেলার জন্য আর কয়টি রমাদান আমার প্রয়োজন?

প্রতিদিন তারাবিতে তিলাওয়াত শুনছেন কয়েক ঘণ্টা করে। কিন্তু তবুও আপনার অন্তর বিগলিত হয় না; এর কারণ কিন্তু এই নয় আপনার ঈমান সব সময় দুর্বল থাকে, কিংবা গোপন পাপগুলো পাঁচিল হয়ে থাকে। বিষয়টি এর চেয়েও সাধারণ এবং দিবালোকের মতো স্বচ্ছ—আপনি কুরআনের ভাষাকে এখনও আপন করে নিতে পারেননি।

বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম তাবারি ﷺ বলেন, 'এমন ব্যক্তিকে দেখে আমি অবাক হই, যে কুরআন পড়ে কিন্তু এর অর্থ বোঝে না। সে কীভাবে এর মজা বুঝবে?!'

আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বশেষ ঐশী বাণীর জন্য আরবি ভাষা নির্বাচন করেছেন, অথচ এই কিতাব সমগ্র মানবজাতির জন্য পাঠানো হয়েছে! তা হলে কেন আরবি ভাষায়? অন্য ভাষায় নয় কেন? অবশ্যই এর পেছনে হিকমাহ আছে।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

'আমি একে আরবি ভাষার কুরআন বানিয়েছি যাতে তোমরা তা বুঝতে পারো।'[১৪৩]

---

[১৪৩] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩।

তিনি আরও বলেন,

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

'আরবি ভাষার কুরআন, যাতে কোনো বক্রতা নেই। যেন তারা মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা পায়।'[১৪৪]

আরেক স্থানে বলেন,

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

'এটি (কুরআন) রব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত। বিশ্বস্ত রূহ (জিবরীল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে—তোমার হৃদয়ে, যেন তুমি সতর্ককারী হতে পারো। (অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।'[১৪৫]

বিখ্যাত ভাষাবিদ আহমাদ ইবনু ফারিস বলেন, 'আরবি ভাষাকে আল্লাহ তাআলা مُبِين বা 'সুস্পষ্ট' শব্দ দিয়ে গুণান্বিত করার দ্বারা এটাই বোঝাচ্ছেন, পৃথিবীর তাবত ভাষার চেয়ে আরবি সেরা।'

আরবি ভাষা ইসলামের ভাষা। যুগ যুগ ধরে এইভাবেই ইসলাম এসেছে, কখনও পাল্টাবে না। তা সত্ত্বেও আমরা যারা এখনও এই ভাষা রপ্ত করার জন্য চেষ্টা করছি না। অনুবাদ পড়ে আল্লাহর কালামের ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে অনেককিছু হারাচ্ছি আমরা, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কুরআনের অলঙ্কার, ভাষাগত মু'জিযা, অন্তর্স্পর্শী ভাব—এগুলো তরজমার মাধ্যমে কখনোই পরিপূর্ণভাবে ফুটে ওঠে না। আর তাই আমাদের পূর্ববর্তীরা অনেক জোরালোভাবে আরবি ভাষা শিখতে বলতেন।

উবাই ইবনু কা'ব ﵁ বলেন, 'যে গুরুত্ব নিয়ে তোমরা কুরআন মুখস্থ করো, সেভাবে আরবি ভাষাও শেখো।'

আবূ বকর ﵁ বলেন, 'তিলাওয়াত করার সময় ব্যাকরণগত ভুল করার চেয়ে কুরআনের কিছু অংশের (হিফয) ভুলে যাওয়াটা আমার কাছে উত্তম।'

একবার উমর ﵁ সদ্য-মুসলিম-হয়ে-আসা কিছু লোকদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা তির ছোড়ার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। একপর্যায়ে তির লক্ষ্যচ্যুত হলে উমর ﵁ তাদের তিরস্কার করেন। কিন্তু আরবি ভাষায় উত্তর দিতে গিয়ে তারা ভুল আরবি বলে

[১৪৪] সূরা যুমার, ৩৯ : ২৮

[১৪৫] সূরা শুআরা, ২৬ : ১৯২-১৯৫

ফেলে। তাদের কথা শুনে উমর ﷺ বলেন, 'তোমাদের এই ব্যাকরণগত ভুল আমার কাছে তির লক্ষ্যচ্যুত হওয়া থেকেও বেশি কষ্টদায়ক।'

হাজ্জ-এর সময়কার কথা। উমর ﷺ এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি হাজ্জ করার সময় ফারসি ভাষায় কথা বলছিল। উমর ﷺ তার কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'আরবিতে কথা বলা শেখো।'

শুধু তাই নয়, আইয়ূব সিখতিয়ানি ﷺ আরবিতে যদি কখনও ব্যাকরণগত করে ফেলতেন, তখন তিনি ইস্তিগফার করতেন। বলতেন, 'আল্লাহ, আমাকে মাফ করুন!'

আলি ইবনু আবী তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ দুজনই তাদের সন্তাদের শাসন করতেন আরবিতে ভুল করলে।

মূলত তাঁরা নিজেদের মানদণ্ড অনেক উঁচুতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন—মুসলিমদের অন্তরের সাথে আরবি ভাষাকে জুড়ে-দেওয়া মানে তাদের পুরো জীবনকেই কুরআনের সাথে জুড়ে-দেওয়া।

আর তাই অতীতে ইসলামের বার্তা প্রসারের সাথে সাথে আরবি ভাষাও দিগ্‌দিগন্ত ছড়িয়ে যেত। মানুষ ইসলাম কবুলের পর দলে দলে আরবি ভাষা শিখত। ফলে সেই সময়ে মুসলিমরা আল্লাহর কালামকে ভিন্ন ভাষায় তরজমা করার প্রয়োজনবোধ মনে করেনি।

বর্তমানে অসংখ্য ভাষায় কুরআনের তরজমা হচ্ছে। এর ফলে এক দিক থেকে অনেক উপকার হয়েছে। কিন্তু একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করলে, এটা আমাদের জন্য দুঃখজনকও বলেও মনে হয়। মুসলিমরা আজ নিজেদের ভাষা আরবি জানে না। এটা তাদের অন্যতম দুর্বলতা।

আপনার অর্জনের ফিরিস্তি হয়তো অনেক দীর্ঘ। হয়তো যে বিষয়ের দিকেই পূর্ণ মনোযোগ দেন, ওই বিষয়টি অর্জন করেই ছাড়েন। অতএব এখনি সময় আপনার সেই যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে জীবন পরিবর্তনকারী সিদ্ধান্ত নেবার।

'আগামী রমাদানে আমি আল্লাহর কালাম সরাসরি বুঝব।'

বলুন, 'ইন শা আল্লাহ।'

এরপর কাজে নেমে পড়ুন!

আমলের স্বাদ হারিয়ে গেলে

দেখতে দেখতে রমাদানের একটি সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। তা সত্ত্বেও আমাদের অনেকের অভিযোগ আছে—'অন্তরে কোনো পরিবর্তন নেই।'

হ্যাঁ, বাহ্যিক আমলে আমরা কোনো কমতি করছি না হয়তো। তবে দুঃখের বিষয় হলো, অন্তরে কোনো রেখাপাত সৃষ্টি হচ্ছে না। যেন ভেতরটা শুষ্ক ভূমিতে পরিণত হয়েছে। কোনো ফলন নেই।

কেন এমনটা হচ্ছে?

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ এমন নিষ্ক্রিয়তার একটি সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন,

إذا لم تجد للعمل حلاوة فى قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب تعالى شكور يعنى أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله فى الدنيا من حلاوة يجدها فى قلبه وقوة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول

> 'আমলের স্বাদ অন্তর অনুভব করতে ব্যর্থ হলে তোমার আমলকেই দোষারোপ কোরো। কেননা আল্লাহ তায়ালা বড়োই কৃতজ্ঞ; অর্থাৎ আমলকারীকে পুরস্কারস্বরূপ দুনিয়াতেই তিনি আমলের স্বাদ আস্বাদন করান। ফলে বান্দা অন্তর দিয়ে এর মিষ্টতা অনুভব করে। তার ভেতরটা প্রফুল্লতা এবং প্রশান্তিতে ভরে যায়। আর যদি সে এমন অনুভূতি না পায়, তা হলে (বুঝে নিতে হবে, তার) আমলের মধ্যেই গণ্ডগোল আছে।'[১৪৬]

কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে আমরা আমলের স্বাদ অনুভব করতে ব্যর্থ হচ্ছি এবং ইবাদাতের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আমাদের পাপই হচ্ছে সেই প্রতিবন্ধক।

যদি এই বাধাকে হটাতে চান, তা হলে সত্য মনে তাকে খুঁজে বের করুন;

---

[১৪৬] মাদারিজুস সালিকীন, ২/৬৮

'এটা কি আমার আন্তরিকতার অভাবের দরুন হচ্ছে?'

'আমি কি আত্মতুষ্টিতে ভুগছি?'

'অনলাইনে কিংবা অফলাইনে নিজেকে যেভাবে উপস্থাপন করি, এসব কি দায়ী?'

ওমুকের সাথে ঝগড়া করার কারণে নয় তো?

'আচ্ছা, আমার আর্থিক অবস্থা কি আমাকে ব্যাহত করছে?'

'এটা কি হিংসার কারণে যা আমার ভেতরটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে?'

'বাবা-মায়ের সাথে খারাপ সম্পর্কের কারণে নয় তো?'

'না কি আমার গোপন পাপের অভ্যাস এসবের পেছনে মূল হোতা?'

'আমার পাপ কম—এমন অহংকারী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য নয় তো?'

মূল সমস্যা আমাদের চোখের সামনেই দণ্ডায়মান। প্রয়োজন শুধু নিজেকে আত্ম-জিজ্ঞাসার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো।

উহাইব ইবনু ওয়ারদ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'পাপে-নিমজ্জিত-ব্যক্তি কি ইবাদাতের স্বাদ অনুভব করতে পারে?' তিনি বললেন لا، ولا من همّ 'না, এমনকি সেও না, যে পাপ কামনা করে।'

অসুস্থ শরীরে ভালো খাবারের স্বাদ অনুভব করতে যেমন বেগ পেতে হয়, তেমনি অসুস্থ অন্তরেও ইবাদাতের স্বাদ অনুভব করতে বেগ পেতে হয়।

নিজের দোষ দেখতে পাওয়া কঠিন। আর সেগুলো প্রতিহত করা আরও কঠিন। কিন্তু এটি অবশ্যই করতে হবে। আর আনন্দের বিষয় হচ্ছে, চেষ্টা অব্যাহত থাকলে এটা শুধু সময়ের ব্যাপার, আপনার নফস আপনার কাছে একদিন আত্মসমর্পণ করবেই ইন শা আল্লাহ।

আবূ যাইদ ﷺ বলেন,

> ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي ، حتى سقتها وهي تضحك
>
> 'যখন আমার নফসকে আল্লাহর দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকলাম, সে কাঁদতে লাগল। এভাবে চলতে চলতে একটা পর্যায় সে আত্মসমর্পণ করল এবং হাসিমুখে মেনে নিল।'[১৪৭]

নফসকে এভাবে পরিশুদ্ধ করার জন্য রমাদানের চেয়ে মোক্ষম সুযোগ আর কী হতে পারে?

---

[১৪৭] সাইদুল খাতির, ১১৪

দুআ : মুমিনের প্রাণ

আচ্ছা, জীবনে কখনও কষ্টে জর্জরিত হয়নি, কখনও কাঁদেনি এমন কেউ কি আছে?

না। পৃথিবীতে এমন মানুষ মেলা ভার। এমন মানুষও আছে, রাতে যাদের ঘুম আসে না। চিন্তার মধ্য দিয়েই তাদের রাত কেটে যায়! কিন্তু এগুলো যে সর্বদা নিজের কারণেই হয়, তাও কিন্তু না। কখনও হয় সন্তানের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। কখনও স্ত্রী-বাবা-মা কিংবা বন্ধুবান্ধবের জন্য। কখনও-বা মাসজিদ আল-আকসার মতো সিরিয়াস বিষয় নিয়ে!

এ ছাড়া আমরা প্রত্যেকেই এমন কিছু বাস্তবতার সম্মুখীন হই, যা কখনও রোধ করা যায় না। যেমন : অসুস্থতা, অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ আপদ, বার্ধক্য ইত্যাদি। এগুলো থেমে থাকে না। আর সবশেষে মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের আরেকটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সে জীবনের শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই। সে জীবন হবে চির আনন্দের, নতুবা দুঃখের।

আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামে বলেন,

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

'আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে।'[১৪৮]

আরেক আয়াতে এসেছে :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

'অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।'[১৪৯]

---

[১৪৮] সূরা নিসা, ৪ : ২৮

[১৪৯] সূরা বালাদ, ৯০ : ৪

পরহেজগার বান্দা হোক কিংবা গাফেল, কেউই দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত নয়। মানুষ এসব থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কেউ অন্যদের বলে বেড়ানোর মাধ্যমে কষ্টকে হালকা করার চেষ্টা করে। কেউ কেউ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লাগাতার মাদক সেবন করে, কেউ-বা হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে মুক্তি খোঁজে। আবার কেউ বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। পক্ষান্তরে এমন মানুষও কিন্তু আছে, যারা এগুলোর কোনোটাই করে না। তারা বোঝে সব সমস্যা সমাধান হবার নয়। আর যে ব্যক্তি মন থেকে ভালো থাকতে চায়, তার শান্তি কেড়ে নেবার ক্ষমতা কারও নেই।

এই জীবন আকাশের মতো। এতে কখনও আনন্দের মেঘ ভাসে, কখনও বেদনার বৃষ্টি ঝরে। হয়তো সচ্ছলতা কিংবা দারিদ্রের কষাঘাতে কারও জীবন টইটম্বুর। তথাপি তাদের মধ্যে একটি বিষয়ের মিল পাবেন; তারা দু-হাত তুলে দুআ করতে জানে। তারা সেই সত্তার কাছে চায়, যিনি সত্যিই প্রতিটি আহ্বান শোনেন। আহ্বানকারী ধনী হোক কী গরীব, মুত্তাকী কী পাপী, তিনি সবার ডাকই শোনেন। তাঁর কাছেই রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান। জীবনে যত কঠিন মুহূর্তই আসুক, তারা প্রশান্তি খুঁজে পায় সেই একজনের সান্নিধ্যে, সেই একজনের সাথে নিবিড় আলাপনে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে।

অতীতের মানুষের কথা আজ নাই-বা বললাম, বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে ভাবলে ইচ্ছে করে চিৎকার করে বলি, 'কোথায় গেলে আল্লাহর বান্দারা! কোথায় হারিয়ে গেল তোমাদের অশ্রুঝরা দুআ?' ওয়াল্লাহি, বর্তমানে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া আমাদের বড্ড প্রয়োজন। অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাঁর কাছে বেশি বেশি দুআ করা, তাঁকে বারবার ডাকা। নিত্যনতুন রোগ-বালাই দেখা দিচ্ছে, পাপের জগৎ হাতের মুঠোয় চলে এসেছে, সংসারের বাঁধন ধরে রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে, সংশয়-সন্দেহ আদর্শে রূপ নিচ্ছে, আল-আকসা কাঁদছে, অপরদিকে রাজনৈতিকভাবে মুসলিম উম্মাহ যাচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে লাঞ্ছনাকর সময়ের মধ্য দিয়ে।

মোদ্দা কথা আমাদের সবার প্রয়োজন আল্লাহকে ডাকা, তাঁর কাছে মুক্তির ভিক্ষা চাওয়া। তাঁকে আমাদের বড্ড প্রয়োজন। আপনার রবকে বোঝান—রহমত পাবার জন্য কতটা মরিয়া আপনি, কতটা অসহায় আপনি। আর নিজেকে আল্লাহর দরবারে এভাবে উপস্থিত করার উপায় একটাই, তাঁর শেখানো পদ্ধতিতে দুআ করা।

তাই আজকের আলোচনার বিষয় 'দুআ কবুলের চাবি'। দুআ কবুল আমাদের অনেকের কাছে এখন রূপকথার গল্পের মতো। মানুষ আশা হারিয়ে ফেলছে, দুআ ছেড়ে দিচ্ছে। তাই আজ আমরা আবিষ্কার করব দুআ কবুলের চাবি। যে চাবি দ্বারা আমরা মাওলার নুসরতের দুয়ার উন্মোচন করব ইন শা আল্লাহ।

১) অন্তরকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিন, আন্তরিক হোন

এমনটা প্রায়ই ঘটে, ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দুআ করছে, কিন্তু তার অন্তর ভিন্ন কিছুতে ব্যস্ত। মুখ নড়ছে, আমীন বলছে, কিন্তু মন অনুপস্থিত। আসলে এমনটা হবার অন্যতম কারণ, আল্লাহর নিকট যা আছে এর চেয়ে মানুষের হাতে যা আছে—মন সেটার প্রতিই বেশি আকৃষ্ট থাকে সেই মুহূর্তে। তাই ওই বিষয়গুলো নিয়ে সে ভাবতে থাকে দুআর সময়েও।

আল্লাহ বলেন,

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

'এবং তোমার রবের প্রতিই মনোনিবেশ করো।'[১৫০]

অন্তরকে শুধু সুস্পষ্ট হারাম সম্পর্ক, মূর্তি কিংবা কবরপূজা থেকেই দূরে রাখা যথেষ্ট নয়। অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ থেকেও পবিত্র করাটাও জরুরি। ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, লাভ-বিনিয়োগ, ইত্যাদি যত রকমের প্রতিবন্ধকতা আছে—অন্তর থেকে এসব বিদায় জানাতে হবে দুআর সময়। দুআর মুহূর্তটি কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করুন, মন-দিল লাগিয়ে তাঁর সাথে কথা বলুন। আল্লাহ বলেন,

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

'..এবং তাঁরই ইবাদাতের জন্য একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডাকো।'[১৫১]

আমাদের মুখের আবদার যেভাবে আল্লাহর কাছে মেলে ধরি, ঠিক সেভাবেই আমাদের মনের ব্যাকুলতা আল্লাহর কাছে মেলে ধরতে হবে। অন্তরের অন্তস্তল থেকে চাইতে হবে।

২) দুআর শুরুটা যেন ভালো হয়

দুআর শুরুতে আল্লাহর গুণকীর্তন করুন এবং নবিজি ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ করুন। দুনিয়ার মন্ত্রীদের কাছে সাহায্য চাইতে গেলে কত গুণকীর্তনই-না করতে হয়, কত আদবের ধারই-না ধারতে হয়! অথচ আমাদের রব রাজাধিরাজ, সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, যাকে ছাড়া প্রতিটি সৃষ্টি অচল। তাঁর দরবারে কোনো প্রশংসাপত্র ছাড়াই আপনার প্রয়োজন পেশ করবেন!?

---

[১৫০] সূরা ইনশিরাহ, ৯৪ : ৮

[১৫১] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৯

একদিনের ঘটনা। রাসূল ﷺ দেখলেন এক ব্যক্তি কোনো প্রকার আদব ছাড়াই দুআ করছে। নবিজি বললেন, 'তাড়াহুড়ো করছে লোকটি।' এরপর বললেন,

إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو بعد بما شاء

'তোমাদের কেউ যখন দুআ করে, সে যেন শুরুতে তার রবের গুণকীর্তন ও প্রশংসা করে। এরপর যেন দরুদ পাঠ করে নবি ﷺ-এর ওপর। তারপর নিজের প্রয়োজন পেশ করে।'[১৫২]

আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ বলেন,

كل دعاء محجوب حتى يصلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم

'প্রত্যেক দুআই ঢাকা থাকে, যতক্ষণ না নবি ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ করা হয়।'[১৫৩]

অর্থাৎ নবিজির ওপর দরুদ পাঠের পরই দুআ উন্মুক্ত হয়।

উমর ﷺ বলতেন,

إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلى على نبيك صلى الله عليه وسلم

'নিশ্চয়ই দুআ আকাশ ও জমিনের মাঝখানে অবস্থান করে। এর কিছুই ওপরে ওঠে না, যতক্ষণ না তুমি নবি ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ করছ।'[১৫৪]

নবিজি ﷺ-এর ওপর অনেকভাবে দরুদ পাঠ করা যায়। যেমন :

১. দুআর আগে দরুদ পাঠ করা, তবে এর আগে আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে।

২. দুআর শুরুতে, মধ্যে, এবং শেষে দরুদ পড়া।

৩. দুআর শুরুতে এবং শেষে পাঠ করা, আর এর মধ্যবর্তী সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বিষয়টি দুআয় তুলে ধরা।[১৫৫]

---

[১৫২] আবূ দাউদ, ১৪৮১; সহীহ

[১৫৩] শুআবুল-ঈমান, ১৪৭৪

[১৫৪] তিরমিযি, ৪৮৬

[১৫৫] ইবনুল কাইয়িম, জালাউল আফহাম, ৩৭৫

সবগুলো পন্থাই গ্রহণযোগ্য।

৩) নিশ্চিত হয়ে দুআ করুন

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চাইবেন না। চাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। এভাবে বলুন : 'আল্লাহ্ আমাকে দিন, আল্লাহ্ আমাকে দান করুন, আল্লাহ্ আমার ওপর বর্ষণ করুন...'।

রাসূল ﷺ বলেন,

لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّ اللهَ لا مُكْرِهَ لَهُ

> 'তোমাদের কেউ যেন এমনটা না বলে "আল্লাহ, আপনি যদি চান আমাকে মাফ করুন। আল্লাহ আপনি যদি চান আমার ওপর রহম করুন।" বরং সে যেন অবশ্যই দৃঢ়তার সাথে দুআ করে। কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।'[১৫৬]

৪) বারবার চান

পরিবারের কাছে কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চাইবার সময় কতবার চাই? দুবার কি তিনবার। এতেও যদি সাড়া না মেলে, তা হলে পরের বার চাইতে লজ্জাবোধ করি। বারবার চাওয়া আমরা সবাই কম-বেশি অপছন্দ করি। কাউকে বিরক্ত করতে চাই না। কিন্তু আল্লাহর নিকট বারবার চাওয়া 'বিরক্তি' নয়; তিনি সবচেয়ে ধনী, দান-দীক্ষায় তাঁর নেই কোনো ভয়, বরং তিনি বারবার চাওয়াকেই পছন্দ করেন। তিনি চান বান্দা তাঁর দরজায় লাগাতার কড়া নাড়ুক।

রাসূল ﷺ-এর দুআর ধরন নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثً

> 'রাসূল ﷺ তিনবার করে দুআ করা এবং তিনবার করে মাফ চাওয়া পছন্দ করতেন।'[১৫৭]

অধিকাংশ সময় এমনটি করতেন তিনি। বর্ণিত আছে কখনও কখনও তিনবারের বেশিও

---

[১৫৬] বুখারি, ৭৪৭৭

[১৫৭] মুসনাদ আহমাদ, ২৯০/৫; সহীহ

দুআ করেছেন। যেমন আহমাস[১৫৮] গোত্রের বরকতের জন্য করা দুআ। এ ছাড়া অসুস্থ ব্যক্তির জন্য একটি দুআ আমাদেরকে সাতবার পুনরাবৃত্তি করতে বলেছেন তিনি।[১৫৯]

আল্লাহর দরবারে বারবার ফিরে যাওয়া, অনুনয় বিনয় করা দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ। এতে প্রমাণিত হয় আপনি শুধু তাঁরই সাহায্যের মুখাপেক্ষী। মন থেকে বিশ্বাস রাখেন, আল্লাহ ছাড়া আপনার কোনো গতি নেই।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন,

ومن أنفع الأدوية : الإلحاح في الدعاء

'সবচেয়ে উপকারী একটি ঔষধ হলো—দুআয় লেগে থাকা।'[১৬০]

৫) মন উপস্থিত তো?

দুআ কবুলের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় অমনোযোগী অন্তর। রাসূল ﷺ বলেন,

ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاهٍ

'দুআ কবুল হবে এই দৃঢ়-বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহকে ডাকো। এবং জেনে রেখো, গাফেল ও অন্যমনস্ক অন্তর নিয়ে করা দুআর জবাব আল্লাহ তাআলা দেন না।'[১৬১]

তাঁকে ডাকুন অন্তরের অন্তস্তল থেকে। এমন ভাবনা নিয়ে ডাকুন, যেন তিনি আপনার সামনেই আছেন। আপনার প্রতিটি বিষয় তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। তিনি সবকিছুই দেখেন ও শোনেন। এই বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে ডাকুন। যে ব্যক্তি এভাবে মন থেকে দুআ করে, সে কি অন্যমনস্ক হতে পারে?

৬) কিবলামুখী হোন

বদর প্রান্তর। অল্প-সংখ্যক সাহাবিদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নবিজি ﷺ। সামনে বিশাল-সংখ্যক মুশরিক বাহিনী। সংখ্যায় দ্বিগুণেরও বেশি। তাদের প্রত্যেকেই যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি

---

[১৫৮] বুখারি, ৪৩৫৭
[১৫৯] আবূ দাউদ, ৩১০৬
[১৬০] আল-জাওয়াবুল কাফী, ১১
[১৬১] তিরমিযি, ৩৪৭৯

নিয়ে এসেছে। সে তুলনায় সাহাবিগণের প্রস্তুতি আপাত-দৃষ্টিতে নেই বললেই চলে। টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছিল তখন। এমতাবস্থায় নবিজি ﷺ এক মিনিটও বেকার যেতে দিলেন না। কিবলামুখী হয়ে দুআয় বসে পড়লেন।[১৬২]

তবে নবিজি ﷺ ভিন্ন দিকে মুখ রেখে দুআ করেছেন এমন ঘটনাও কিন্তু বিরল নয়। এজন্য ইমাম নববি রহ. বলেন, 'কিবলামুখী হয়ে দুআ করা মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)।'[১৬৩]

৭) হাত পাতুন

এক হাদীসে কুদসিতে রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا

> 'নিশ্চয়ই তোমাদের মহিমান্বিত রব অত্যন্ত লজ্জাশীল এবং দয়াবান। বান্দা যখন তাঁর সমীপে হাত ওঠায়, তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।'[১৬৪]

দু-হাত পেতে চাওয়া বিনয় এবং অসহায়ত্বের পরিচায়ক। আল্লাহর প্রতি দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু দুআয় হাত তোলার পদ্ধতি কী? আলিমগণ পরিস্থিত বিবেচনায় তিনটি পদ্ধতির কথা বলেছেন :

প্রথম পদ্ধতি : শাহাদাত আঙুল উত্তোলন করা। রাসূল ﷺ এমনটাই করতেন বেশকিছু জায়গায়, যেমন মিম্বারে দাঁড়িয়ে দুআ করার সময়, তাশাহহুদের সময়। তেমনিভাবে কেউ যদি জনসাধারণের পক্ষ থেকে দুআ করতে চায়, সেও অনুরূপ করতে পারে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : স্বাভাবিক নিয়ম এটি। অর্থাৎ হাতের তালু দুটো একত্রে লাগিয়ে, আকাশের দিকে উত্তোলন করে, কাঁধ বরাবর রেখে দুআ করা।

তৃতীয় পদ্ধতি : দুআর পেছনে যখন বৃহৎ কোনো স্বার্থ থাকে। আরবিতে একে বলা হয় ابتهال (ইবতিহাল)। উদাহরণস্বরূপ, সমগ্র উম্মতের জন্য কার্যকরী কোনো দুআ, কাফিরদের ক্ষেত্রে বদদুআ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ হাত এত উঁচুতে তুলে ধরতেন যে, তার বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেয়ে যেত। বদরের দিন এরকম করেছিলেন তিনি।

---

[১৬২] মুসলিম, ১৭৬৩

[১৬৩] নববি, শারহু মুসলিম, ৬/১৮০

[১৬৪] সহীহ ইবনু হিব্বান, ৮৭৬

৮) সুখে-দুঃখে, সর্বাবস্থায় দুআ করা

আদবের অংশ এটি। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই এই আদবের বরখেলাপ করে। শুধু প্রয়োজনের সময় দুআর দ্বারস্থ হয়। কেবল বিপদে পড়লে আল্লাহকে চেনে। অন্য সময়গুলোতে দুআর কোনো প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করে না। যখন প্রচণ্ড আঘাত পাই, শত্রুর সম্মুখীন হই, অর্থনৈতিকভাবে একটু দোটানায় থাকি, সিভি জমা দিয়েও ইন্টারভিউয়ের ডাক আসে না, কিংবা অন্যকোনো বিপদাপদের সম্মুখীন হই—তখনই আমরা দুআ করি কেবল। নিঃসন্দেহে দুর্দিনে আল্লাহর অভিমুখী হওয়া প্রশংসনীয় কাজ, তদ্রূপ সুদিনেও অনুরূপ করা চাই।

নবিদের দুআ কেন কবুল হয়—এর উত্তরে আল্লাহ্ বলেছেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

'নিশ্চয় তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। এবং আমাকে আশা ও ভয় নিয়ে ডাকত। আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়ী।'[১৬৫]

এই আয়াতে দুআ কবুলের পেছনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ এসেছে :

১) 'সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত'

তাদের জীবন ছিল ইসলামের আলোয় আলোকিত, আল্লাহর ইবাদাত এবং তাঁর গুণকীর্তনের সমষ্টি। ঠিক এই কারণে আল্লাহকে ডাকা-মাত্রই তারা সাড়া পেয়েছেন।

২) 'আমাকে আশা ও ভয় নিয়ে ডাকত'

অবস্থা যেমনই হোক, তারা আল্লাহর কাছে হাত তুলতেন। সুখে আছে না দুঃখে, নিরাপদে আছে না ভয়ে—এগুলো তাদের দুআর পথে প্রতিবন্ধক হতে পারত না।

৩) 'আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়ী'

আত্মতুষ্টি, জেদ, দাম্ভিকতা—অহংকারের ছিটেফোঁটাও ছিল না নবিদের অন্তরে। এগুলো তাঁরা গোড়া থেকে উচ্ছেদ করে ফেলেছেন। তা ছাড়া যে অন্তর আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত, তার দুআ কীভাবে কবুল হবে?

মোদ্দা কথা, আপনি যদি চান দুর্দিনে আপনার ডাক শোনা হোক, তা হলে সুদিনে দুআর পরিপূর্ণ ঝুড়ি নিশ্চিত করুন। এটাই সহজ পদ্ধতি।

---

[১৬৫] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৯০।

রাসূল ﷺ বলেন,

من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد، فليكثر الدعاء في الرخاء

'যে চায় কঠিন সময় আল্লাহ তার দুআর জবাব দিক, সে যেন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে বেশি বেশি দুআ করে।'[১৬৬]

নবি ইউনুস ﷺ-এর অগ্নিপরীক্ষার কাহিনি আমরা সবাই জানি। কওমের প্রতি হতাশ হয়ে তিনি যখন স্বদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, এক তিমি তাঁকে গিলে ফেলে। মুহূর্তেই ইউনুস ﷺ নিগূঢ় অন্ধকারে নিজেকে আবিষ্কার করলেন। রাতের অন্ধকার, সমুদ্রের অন্ধকার, তিমির পেটের অন্ধকার। চারিদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। তবুও হাল ছেড়ে দেননি তিনি। দুআ করলেন :

لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

'আপনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি জালিমদের একজন ছিলাম।'[১৬৭]

দুআ কবুল হয়েছিল। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে আল্লাহ তাকে এই অন্ধকার থেকে মুক্তি দেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তার দুআ কবুল হয়েছিল?

আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন :

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ , لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

'সে যদি আল্লাহর মহিমা ঘোষণাকারীদের একজন না হতো, তা হলে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত মাছের পেটে থাকত'[১৬৮]

অর্থাৎ অগ্নিপরীক্ষায় পতিত হবার পূর্বেই যদি তিনি কোনো নেক আমল না করতেন, তা হলে তিমির পেটেই তাঁর কবর রচিত হতো। 'সে যদি আল্লাহর মহিমা ঘোষণাকারীদের একজন না হতো' এই আয়াতাংশের তাফসীরে কাতাদা ﷺ বলেন,

كان كثير الصَّلاةِ في الرّخاء، فنجّاه الله بذلك؛ قال: وقد كان يقال في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما عَثَر، فإذا صُرِع وجد متكئا

[১৬৬] তিরমিযি, ৩৩৮২

[১৬৭] সূরা আম্বিয়া ২১ : ৮৭

[১৬৮] সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৪৩-১৪৪

'স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তিনি অনেক সালাত পড়তেন। তাই আল্লাহ এর বদৌলতে তাকে রক্ষা করলেন। বর্ণিত আছে "নেক আমলকারী হোঁচট খেলে তার আমল তাকে তুলে ধরে। আর সে যদি পড়ে যায়, ভর দেবার কিছু-না-কিছু পেয়েই যায়।'[১৬৯]

আবুল আলিয়া ﷺ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

كان له عمل صالح فيما خلا

'তিনি আগেই নেক আমল পাঠিয়েছিলেন।'[১৭০]

ঠিক এই জন্যই ইউনুস ﷺ পরীক্ষায় পতিত হলে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে পাশ করে বেরিয়েছেন। অতএব কেবল বিপদে পড়লেই দুআ করবেন না। নবিজি ﷺ যুব-সমাজকে শিখিয়ে গেছেন :

تَعرفْ إلى اللهِ في الرخاءِ يعرفْكَ في الشدةِ

'স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে চেনো, তা হলে কঠিন সময়ে তিনি তোমাকে জানবেন।' (অর্থাৎ তোমাকে সাহায্য করবেন)[১৭১]

আলহামদু লিল্লাহ অনেক বিপদ থেকে আপনি বেঁচে আছেন, যা থেকে নিস্তার পেতে অন্যরা হয়তো দিবারাত্রি লড়াই করে চলছে। আপনার অর্থনৈতিক অবস্থা হয়তো বেগতিক নয় এতটা। অপরদিকে এমন মানুষ পাবেন, যারা বিভিন্ন রোগ-শোকে আক্রান্ত। চিকিৎসায় তাদের কষ্টে অর্জিত প্রায় সব সহায় সম্পদ ঢেলে দিতে হচ্ছে। কিন্তু আপনি একদম সুস্থ, দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে এইসব বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

তা সত্ত্বেও আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কিছু পরীক্ষা অবধারিত। মৃত্যুর যন্ত্রণা, কবরের অন্ধকার, মুনকার নাকিরের প্রশ্ন, হাশরের ভয়াবহতা, হিসাবের জন্য ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা; অনিশ্চিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা, জাহান্নামের ওপর বসানো পিচ্ছিল পুলসিরাত অতিক্রম করা, এ ছাড়া কিয়ামাত-দিবসে বহু ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে আমাদের।

এই পরীক্ষাগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের সবাইকে যেতে হবে। আমরা বড়োজোর এগুলোর

---

[১৬৯] তাফসীর আত-তাবারি, ১৯/৬২৮

[১৭০] প্রাগুক্ত, ১৯/৬২৯

[১৭১] কুরতুবি, ৬/৩৯৮; হাসান

ভয়াবহতা কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারি। জানেন কীভাবে?

ইউনুস ﷺ-এর মতো করে। কঠিন পরীক্ষায় দেবার আগেই পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে, নেক আমল দিয়ে।

ভাইরে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে জেনেছে এবং দুনিয়ার জীবন তাঁর ইবাদাতে কাটিয়েছে, অপরদিকে যে ব্যক্তি কোনো-প্রকার প্রস্তুতি ছাড়াই কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াবে—উভয়ের ফলাফল কিন্তু কখনোই এক হবে না। আজ বোঝা না গেলেও সেদিন উভয়ের মধ্যে কল্পনাতীত পার্থক্য সূচিত হবে।

তেমনি এটাও স্মরণে রাখতে হবে, যারা সত্যিকারার্থে মন থেকে দুআ করে, তারা কখনোই 'বিপদের' অপেক্ষায় থাকে না। বরং দুআ তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী, আল্লাহর দরজাতেই কাটে তাদের দিবারাত্রি। বর্তমান বিপদাপদ দূরীকরণের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ বিপদাপদ ধেয়ে আসার পূর্বেই তারা আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তাদের তাবত প্রস্তুতি গ্রহণে একটি অস্ত্রই থাকে—দুআ। দুআই সেই অস্ত্র। মুমিনের হাতিয়ার।

দুর্দিনে দুআ তাদের সুরক্ষা-দ্বার, আর সুদিনে ভালোবাসার চাদর। দুআ তাদের জীবন, তাদের ভালোবাসা। দুআর মাধ্যমে তারা ছুটে যায় সাত আসমান ছাড়িয়ে এবং হারিয়ে যায় মাওলার সাথে নিবিড় আলাপনে।

আর কতকাল আমরা এই ইবাদাতের স্বাদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকব? আসুন না শুরু করি নতুন একটি দিন! যে দিনটি শুরু হবে নিবিড় আলাপন দিয়ে, শেষও হবে নিবিড় আলাপন দিয়ে... আল্লাহর সাথে!

সব রোগের কার্যকরী ঔষধ

বিখ্যাত হাদীস-বিশারদ আবূ আবদুল্লাহ হাকিম নিশাপুরি ﷫। মাসের-পর-মাস তিনি একটি রোগে ভুগছিলেন। বেশ কিছু ফোসকা ছিল তাঁর চেহারায়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এর চিকিৎসা করিয়েছেন দীর্ঘ এক বছর যাবৎ। কিন্তু আশানুরূপ কোনো ফল পাননি।

এক জুমার দিন তিনি ইমাম আবূ উসমান সাবূনির কাছে যান। খুতবা চলাকালে তার জন্য দুআ করতে অনুরোধ করলেন। ইমাম আবূ উসমান দুআ করলেন। উপস্থিত মুসল্লিরাও শরীক হলো সেই দুআয়।

সপ্তাহ খানেক পরের কথা। এক মহিলা একটি চিঠি পাঠান হাকিম ﷫-কে। চিঠিতে তিনি জানান, সেদিনের দুআয় তিনিও উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর অসুস্থতা শুনে ব্যথিত হয়েছেন। তাই তিনি বাসায় ফিরে তাঁর জন্য দুআ করেন। অতঃপর সেদিন সন্ধ্যায় রাসূল ﷺ-কে স্বপ্নে বলতে শুনলেন :

قُولُوا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: يُوَسِّعُ الْمَاءَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

'আবূ আবদুল্লাহ-কে বলো, সে যেন মুসলিমদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে।'

চিঠিটি হাকিমকে দেখানো হলে তিনি তাৎক্ষণিক নিজের বাগানে যান। সেখানে একটি পুকুর খনন করে তাতে বরফ ছেড়ে দেন এবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। এরপর কী হলো?

এক সপ্তাহ যেতে-না-যেতেই তার ফোসকা নিরাময় হতে শুরু করল। এবং একপর্যায়ে তা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার চেহারা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। পরবর্তীকালে আরও কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন তিনি।'[১৭২]

---

[১৭২] শুআবুল ঈমান, ৩১০৯

দান-সদাকা করা—এ এমন এক ঔষধ, অধিকাংশ ডাক্তারই রোগীদের প্রেসক্রিপশনে লিখতে ভুলে যান।

এরকম আরেকটি ঘটনা আমরা জানতে পারি লেখক শাইখ আলি ফীফীর 'লি আন্নাকাল্লাহ' বই থেকে। তিনি তার এক বন্ধুর গল্প শুনিয়েছেন এতে,

একদিন মাসজিদে যাবার পথে তিনি অ্যাক্সিডেন্ট করেন। তার দুই বছরের ভাগ্নির ওপর চাকা উঠে গেছে। বাচ্চাটিকে বের করে দ্রুতবেগে হাসপাতালে ছুটে যান তিনি। এর মধ্যে মৃত্যু ছুঁইছুঁই অবস্থা। ডাক্তারগণ চেকাপ করে পরিবারকে জানান, বাচ্চাটির মৃত্যুর সম্ভাবনা ৮০%!

এ অবস্থায় তাদের এক আত্মীয় উপদেশ ও সান্ত্বনা লাভের আশায় একজন তলিবে ইলমকে ফোন করে। ঘটনা শুনে সে বলে, 'একটি পশু যবেহ করুন এবং মেয়েটির সুস্থতার নিয়ত করে এর মাংস বিতরণ করে দিন।' তারা সেটাই করল। পরবর্তীকালে সেই বন্ধুটি বলেন, 'ভোর হতে-না-হতেই আমার ভাগ্নি একদম সুস্থ অবস্থায় হাসপাতাল থেকে রিলিজ পেয়ে গেল।'

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷬ বলেন,

فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر

'বিভিন্ন প্রকারের বিপদ-আপদ দূরীকরণে দান-সদাকার প্রভাব আশ্চর্যদায়ক; যদিও দানকারী পাপী, জালিম কিংবা কাফির।'[১৭৩]

মুনাওয়ি ﷬ বলেন,

و قد جرب ذلك الموفقون فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية ولا ينكر ذلك إلا من كثف حجابه

'আল্লাহর সৌভাগ্যবান (বান্দাগণ দানের) বিষয়টি প্রয়োগ করে এমন আধ্যাত্মিক সমাধান পেয়েছেন, যা অতি কার্যকরী ঔষধও দিতে পারে না। আর এর সত্যতা কেবল সে ব্যক্তিই অস্বীকার করবে, যে নিজেকে সত্য দেখা থেকে আড়াল করে রাখে।'[১৭৪]

---

[১৭৩] আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যিব, ৩১
[১৭৪] ফাইযুল কাদীর, ৩/৫১৫

দান-সদাকা বিপদাপদ হটিয়ে দেয়, ব্যথা লাঘব করে, দুর্দশা থেকে মুক্তি দেয়। আর ভেতরে ভেতরে রহমতের এমন বিশাল ময়দান তৈরি করে, যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপা যায় না।

আপনি কি স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত? দুর্দশাগ্রস্ত? এখনই বসে পড়ুন এবং এই নিয়তে দান-সদাকার জন্য কিছু টাকা রেডি করে ফেলুন। আর এ কাজের জন্য রমাদানের চেয়ে উত্তম মাস আর কী হতে পারে? ভবিষ্যৎ-জীবনে-আসন্ন-বিপদাপদ এখনই নিশ্চিহ্ন করে ফেলুন ইন শা আল্লাহ।

ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন,

> 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল ছিলেন। কিন্তু রমাদান এলে দান-সদাকা আরও বাড়িয়ে দিতেন।'[১৭৫]

---

[১৭৫] বুখারি, ৩৫৫৪

একটি দুআর গল্প

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

'রব আমার, আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি দুআ শ্রবণকারী।'[১৭৬]

সন্তান নিয়ে ভাবনা রাতের আরামের ঘুম হারাম করে দেয় বহু মা-বাবার। ওদেরকে কোন স্কুলে দেব, কোন শিক্ষকের কাছে পড়াব, ওদের কেমন রেজাল্ট হবে ইত্যাদি চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। আর মা-বাবা যদি দ্বীনদার হয়, তা তো হলে ভাবনার ফিরিস্তিতে আরও অনেককিছু যুক্ত হয়। ওরা কেমন মুসলিম হবে, বড়ো হলে কতটুকু ইসলাম পালন করবে, ফিতনার যুগে ইসলামের ওপর কীভাবে অটল থাকবে, আখিরাতকে কতটুকু গুরুত্ব দেবে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে আপনি যতই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন না কেন, ফলাফল আকাশেই নির্ধারণ করা হয়। তাই চেষ্টার পাশাপাশি এই দুআর বিকল্প নেই।

এই প্রবন্ধের শুরুতে একটি দুআ উল্লেখ করেছি। বলতে পারেন, দুআটি কার? দুআটি নবি যাকারিয়্যা ﷺ করেছিলেন। আর এই দুআর পেছনে মূল প্রেরণা ছিল একজন নারী। তিনি হলেন মারইয়াম ﷺ।

মারইয়াম ﷺ-এর দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন যাকারিয়্যা ﷺ। দিনকে দিন এটা স্পষ্ট হতে থাকে যে, মারইয়াম কোনো সাধারণ মেয়ে নন। যাকারিয়্যা ﷺ যখনই মারইয়াম ﷺ-এর ইবাদাতখানায় প্রবেশ করতেন, রিযকের বাহার দেখতে পেতেন। গ্রীষ্মকালে মারইয়াম ﷺ-এর কাছে শীতকালের খাবার পাওয়া যেত। আবার শীতকালে গ্রীষ্মের খাবার!

---

[১৭৬] সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ৩৮

আল্লাহ বলেন,

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّـهِ ۖ إِنَّ اللَّـهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'যখনই যাকারিয়্যা মারইয়ামের কক্ষে প্রবেশ করত, তার কাছে খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেত; জিজ্ঞেস করল, "মারইয়াম! এসব কোত্থেকে তোমার কাছে আসে?" মারইয়াম বলল, "ওসব আল্লাহর নিকট হতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বেহিসাব রিযক দান করেন।"'[১৭৭]

আল্লাহর বদান্যতার নজির দেখে যাকারিয়্যা ﷺ তো যারপরনাই অবাক। তিনি আর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন না। সাথে সাথে ছুটে গেলেন মাওলার দুয়ারে। কড়া নাড়লেন তাঁর রহমতের দরজায়। আর আল্লাহ তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি!

আল্লাহ বলেন,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

'ওখানেই যাকারিয়্যা তার রবের কাছে দুআ করল, "রব আমার, আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি দুআ শ্রবণকারী।"'[১৭৮]

সম্ভাবনার সব ক'টা দরজা যাকারিয়্যা ﷺ-এর জন্য বন্ধ ছিল। তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। চুল পাঁকতে শুরু করেছিল অনেক আগেই। শরীরের অস্থিমজ্জাও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন সন্তান-দানে অক্ষম। কিন্তু আল্লাহ তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি। এই বৃদ্ধ বয়সে যা পাবার আকাঙ্ক্ষায় আল্লাহকে ডেকেছিলেন, তা-ই দান করেছেন। বিস্ময়করভাবে আল্লাহ তাআলা সাড়া দিয়েছেন। আসুন, এই ফাঁকে যাকারিয়্যা ﷺ-এর দুআয় ব্যবহৃত শব্দগুলো একটু বিশ্লেষণ করি। দেখি, তিনি কী এমন শব্দ ব্যবহার করেছিলেন যার ফলাফল এরকম আশ্চর্যজনক ছিল!

যাকারিয়্যা ﷺ-এর দুআটি হলো :

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

'রব আমার, আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করুন।'

---

[১৭৭] সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ৩৭
[১৭৮] সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ৩৮

আয়াতে هَبْ শব্দটি এসেছে, যার অর্থ দান করুন। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'হিবা চাওয়া'। আর হিবা এমন এক উপহারকে বলা হয়, যা কখনও ফিরিয়ে নেওয়া হয় না। অর্থাৎ, যাকারিয়া ﷺ আল্লাহর নিকট এমন একটি নেক সন্তান আশা করছিলেন, যা হবে আল্লাহর তরফ থেকে বিশেষ উপহার, কখনও ফিরিয়ে নেওয়া হবে না।

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

'রব আমার, আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করুন।'

শব্দচয়ন দেখে বোঝা যায় যাকারিয়া ﷺ কোনো সাধারণ সন্তান চাননি। তিনি এমন সন্তান চেয়েছেন, যে হবে আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা, তাঁর নিরাপত্তার বেষ্টনীতে রক্ষিত এবং তাঁর দয়ার চাদরে প্রতিপালিত।

আচ্ছা, 'আমাকে একটি উপহার দিন' আর 'আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উপহার দিন'—এ দুটো বাক্যের মধ্যে পার্থক্য কী?

দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে একান্ত ভাবের প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ অনুরোধটা স্রেফ উপহারের জন্য নয়, বরং এমন উপহারের জন্য, যা দানকারী দয়াস্বরূপ দেবেন। করুণাবশত দেবেন। আর উপহারটি হবে তাঁর সম্মান ও রাজত্বের সাথে মানানসই। এখন প্রশ্ন হলো, যাকারিয়া ﷺ তা হলে এমন একজন সত্তাকে ডেকে কী উত্তরে পেয়েছিলেন, যিনি রাজাধিরাজ, ধনীদের ধনী, দয়ার আধার? ইন শা আল্লাহ সামনেই জানতে পারব আমরা। আপাতত দুআয় ফিরে যাই :

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

'রব আমার, আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করুন।'

সন্তানের বাবা হওয়াই যাকারিয়া ﷺ-এর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল না। স্রেফ বাবা হতে পারাকে তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। বরং তাঁর বিবেচ্য-বিষয় ছিল সন্তানের দ্বীনদারিতা। সে যেন নেককার হয়। তাঁর দুআর বাক্যটি দেখুন 'একটি পবিত্র সন্তান।'

কত মুসলিম দম্পতি-ই তো বছরের-পর-বছর আল্লাহর নিকট সন্তান চেয়ে দুআ করে! অতঃপর সেই সন্তান দুনিয়াতেই কারও জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়, কারও জন্য আখিরাতে। এসব ক্ষেত্রে ভুল মূলত একটা জায়গাতেই হয়—তারা আল্লাহর কাছে কেমন সন্তান চাইছেন, এ ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথাই থাকে না। তাদের কাছে স্রেফ নিঃসন্তান থাকাটাই বেদনাদায়ক। আর সেই কষ্ট দূর করতে পারাটাই তাদের দুআর মূল উদ্দেশ্য।

আয়াতে 'একটি পবিত্র সন্তান' বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? এ বাক্য দিয়ে দুআ করার বিশেষত্ব কী? আলিমগণ বলেন,

الذُّرِّيَّة الطيِّبة، هى الطيِّبة فى أقوالها، وأفعالها، وكذلك فى أجسامها، فهى تتناول الطيب الحسّيّ، والطيِّب المعنوى

'পবিত্র সন্তান বলতে বোঝায়, যার কথা পবিত্র, কাজ পবিত্র, তেমনি দেহও পবিত্র। অর্থাৎ এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দৈহিক ও মানসিক—উভয় পবিত্রতা।'[১৭৯]

এই নববি দুআ ব্যবহার করা মানে—আপনি আল্লাহর দরবারে এমন সন্তানের জন্য মিনতি করছেন, যার বিশ্বাস হবে পবিত্র, জবান হবে পবিত্র, কাজ-কর্ম পবিত্র, এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। মোটকথা দুনিয়ার সকল দৃষ্টিকোণ থেকে হবে সেরা।

আমরা দেখছি, আমাদের সন্তানেরা কতভাবে বিপথে চলে যাচ্ছে। তাদের এই বিপথগামীতার জন্য আমাদের বেখেয়ালিপনাও দায়ী। তাদের অধিকার আছে আমাদের বেখেয়ালি আচরণ দেখে হতাশ হবার। কেননা, এই আচরণ তো তাদের সাথে জন্মের আগ থেকেই আমরা করে আসছি। বুঝতে পেরেছেন, কোন বেখেয়ালির কথা বলছি? তাদের কল্যাণের জন্য আমরা উপযুক্ত দুআ করিনি। সত্যিই আমরা দুআ করিনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটাই হয়, বাবা-মায়েরা এই কাজটির কথা একদম ভুলে যান।

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

'রব আমার, আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করুন। অবশ্যই আপনি দুআ শ্রবণকারী।'

নবি যাকারিয়্যা ﷺ তার দুআ শেষে আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম উল্লেখ করেন। নামটি এসেছে سمع অর্থাৎ শ্রবণ করা ক্রিয়া থেকে। যাকারিয়্যা ﷺ খুব ভালো করেই জানতেন, তার চাওয়া-বিষয়টি দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে কল্পনাতীত। কোনো মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। আর তাই এমন এক শ্রোতার প্রয়োজন, যিনি সত্যিই তার দুআ শুনবেন এবং এই অসম্ভবকে সম্ভব করবেন। এভাবে যাকারিয়্যা ﷺ আমাদের শিখিয়ে দিলেন, দুআর ক্ষেত্রে আল্লাহর গুণবাচক নাম ব্যবহার করা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এমন নাম, যা আমাদের দুআর বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যে ব্যক্তি অর্থনৈতিকভাবে দুরাবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সে দুআয় আল্লাহর এই নামগুলো উল্লেখ করবে— اَلرَّزَّاقُ (রিযকদাতা), اَلْغَنِيُّ (সবচেয়ে ধনী), اَلْكَرِيْمُ (মহানুভব), এরকম

---

[১৭৯] ইবনু উছাইমীন, তাফসীর, ১/২৩২

আরও যত নাম আছে। আবার যালিমের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট ন্যায়বিচার কামনাকারী বলবে— اَلْقَيُّوْمُ (সবচেয়ে শক্তিধর), اَلْجَبَّارُ (পরাক্রমশালী), اَلنَّصِيْرُ (সাহায্যকারী)। আসলে আল্লাহর নামসমূহ নিয়ে আমাদের পড়াশোনা করা খুব জরুরি।

যাকারিয়্যা ﷺ-এর দুআর শুরুটা ছিল উত্তম, মাঝের কথাগুলোও উত্তম, এবং শেষটাও ছিল উত্তম। আন্তরিকতা এবং আস্থায় গোটা দুআ ছিল ভরপুর। ফলে এর জবাবও ছিল কল্পনাতীত। দুআ করতে-না-করতেই ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো সুসংবাদ দিয়ে। আল্লাহ বলেন,

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّـهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

'তখন এর জবাবে তাকে ফেরেশতাগণ বলল, আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দান করেছেন। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফরমানের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে আসবে। তার মধ্যে নেতৃত্ব ও সততার গুণাবলী থাকবে। সে পরিপূর্ণ সংযমী হবে, নুবুওয়াতের অধিকারী হবে এবং সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে।'[১৮০]

দায়িত্ববান মুসলিম পিতা-মাতা-মাত্রই নবি ইয়াহইয়া ﷺ-এর মতো নেক সন্তানের স্বপ্ন দেখে। তাদের জন্য এই দুআ গুপ্তধনের চেয়েও দামি। এটাই ছিল নবি যাকারিয়্যা ﷺ-এর দুআর ফসল।

পাশাপাশি দুআ কবুলের কিছু কার্যকরী পদ্ধতি আছে। আসুন জেনে নিই :

১) দুআর শুরুটা যেন ভালো হয়

মূল দুআয় যাবার আগে শুরুটা করুন আপনার অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। আল্লাহর দরবারে মেলে ধরুন আপনার দুর্বলতা। দাসত্বের মন নিয়ে দুআ শুরু করুন এবং বোঝান— আপনি আল্লাহর প্রতি কতটা আন্তরিক। এমনটাই করেছিলেন যাকারিয়্যা ﷺ। সূরা মারইয়ামে আল্লাহ তাআলা তার দুআর পটভূমি তুলে ধরেছেন এভাবে,

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

'সে বলল, হে আমার রব, আমার হাড়গুলো পর্যন্ত নরম হয়ে গেছে, মাথা বার্ধক্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হে পরওয়ারদিগার, আমি কখনও তোমার কাছে

[১৮০] সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ৩৯।

দুআ চেয়ে ব্যর্থ হইনি।'[১৮১]

অন্যভাবে বললে :

আপনি আমাকে কখনোই হতাশ করেননি। কখনোই খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, আপনি কতটা দয়াবান, করুণাময় এবং কত উদার। এটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আপনি আমাকে এগুলোর সাথেই অভ্যস্ত করিয়েছেন।

২) নিশ্চিত থাকুন, কবুল হবে

দুআর সময় আল্লাহর কাছে আপনি কী আশা করছেন? তিনি কবুল করবেন—এ ব্যাপারে কতটুকু নিশ্চিত আপনি? যাকারিয়া ﷺ-কে দেখুন, তিনি ঠিক ততটাই নিশ্চিত মনে দুআ করেছিলেন, যতটা নিশ্চিত একজন নবি হতে পারেন। আমরা এও দেখেছি, এই দুআ ছিল মারইয়াম ﷺ-এর কথার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। অর্থাৎ যখন তিনি জানালেন যে মারইয়াম ﷺ-এর রিযক আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তখনি দুআ করলেন। আল্লাহ বলেন, 'ওখানেই যাকারিয়া তার রবের কাছে দুআ করল...'

অর্থাৎ এক মিনিটও নষ্ট করেননি তিনি। সকল প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা ব্যতিরেকে হাত তুলেছেন। আল্লাহর দরবারে ভিক্ষা চেয়েছেন দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে।

আপনিও তা-ই করুন। যখনই কাউকে ভালো কিছু পেতে দেখবেন—জাগতিক হোক কিংবা পরকালীন—দ্বিতীয়বার ভাববেন না, তাৎক্ষণিক আড়ালে চলে যান এবং মহান আল্লাহর সামনে মনখুলে ভিক্ষা চান।

৩) দুআ হোক আখিরাতমুখী

যাকারিয়া ﷺ কেন নেক সন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন, সূরা মারইয়ামে আল্লাহ তাআলা আমাদের তা জানিয়েছেন। কারণটা নবির মুখেই শুনুন, তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার পর নিজের স্বগোত্রীয়দের অসদাচরণের আশংকা করি...'[১৮২]

এখানে 'স্বগোত্রীয়' কারা যাদের ব্যাপারে তিনি আশঙ্কা করছিলেন? আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুর রহমান ইবনু নাসির সা'দী ﷺ বলেন,

وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي، ألاّ يقوموا بدينك حق القيام'

[১৮১] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৪
[১৮২] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫

ولا يدعوا عبادك إليك

'(যাকারিয়্যা ﷺ বলছেন) আমার মৃত্যুর পর যারা বানী ইসরাঈলের মধ্যে থাকবে, আমার আশঙ্কা, তারা আপনার দ্বীনকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করবে না, আপনার বান্দাদেরকে আপনার পথে আহ্বান করবে না।'[১৮৩]

মুমিনের ধন, সম্পদ, বিয়ে, সন্তান-সন্ততি—সবকিছুর পেছনে বৃহত্তর স্বার্থ থাকে। মুমিনের নিয়ত থাকে স্বচ্ছ। সে এগুলোকে জান্নাতে পৌঁছাবার পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং দুনিয়ার জীবনে উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে যায়। একজন সচেতন মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু পেটপুরে খাওয়া আর রঙ-বেরঙের পানীয় পান করা নয়, তার জীবনটা ক্রিয়াকৌতুক করে কাটিয়ে দেবার জন্য নয়, বরং এসবের ঊর্ধ্বে বসবাস করে সে। তার চিন্তাধারা হয় নিঃস্বার্থ, তার চিন্তাধারা হয় বিস্তৃত। তার সকল কাজেকর্মে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই দুআ দ্বারা নবি যাকারিয়্যা ﷺ আমাদেরকে শেখাচ্ছেন, মুসলিম-মাত্রই চিন্তা-ভাবনায় হবে উন্নত। তাদের পরিকল্পনা হবে আখিরাত-কেন্দ্রিক এবং জীবন হবে ইসলামের জন্য নিবেদিত, তারা এর জন্যই বেঁচে থাকে। দুনিয়া থেকে বিদায়ও নেয় বুকে এই আশা রেখে যে, কাল হাশরের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের পরিশ্রম বৃথা যেতে দেবেন না।

৪) আপনার জীবনের গল্প হোক দুআময়

যদি রিযকের কথা বলি তা হলে মানবজাতির জন্য তো বটেই, সমগ্র সৃষ্টিকুলের দুআ করা প্রয়োজন। কেননা আল্লাহ তাআলা সকলের রিযকদাতা। নবি যাকারিয়্যা ﷺ-এর জীবনে দুআ ছিল অপরিহার্য বিষয়, যার প্রয়োজন তিনি বারবার অনুভব করতেন।

দেখুন, আল্লাহ তাআলা যাকারিয়্যা ﷺ-এর ব্যাপারে কী বলেছেন:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ

'ওখানেই যাকারিয়্যা তার রবের কাছে দুআ করল..'[১৮৪]

এ ছাড়া তার ব্যাপারে এও বলেছেন :

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا

'যখন সে তার রবকে গোপনে ডেকেছিল।'[১৮৫]

[১৮৩] তাফসীর ইবনু সা'দী, ৪৮৯
[১৮৪] সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ৩৮
[১৮৫] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩

ভিন্ন এক আয়াতে এসেছে :

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ

'আর স্মরণ করো যাকারিয়্যাকে, যখন সে তার রবকে ডেকেছিল..'[১৮৬]

এভাবে কুরআনের তিন-তিন জায়গায় আল্লাহ তাআলা যাকারিয়্যা ﷺ-এর কথা বলেছেন। আর সবগুলোর মূল বিষয়বস্তু ছিল দুআ।

হ্যাঁ, আপনার জীবনও হোক একটি দুআর গল্প।

---

[১৮৬] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৯

মুমিনের সামাজিকতা

আমরা সামাজিক জীব। আমাদের জীবনে প্রতি পদে পদে প্রয়োজন হয় সঙ্গী-সাথির। পরিবার এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে থাকতে পছন্দ করি আমরা। অন্যদের সাথে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো ভাগাভাগি করতে আমাদের ভালো লাগে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার, ভার্চুয়াল জগতের প্রতি ঝোঁক—এসবকিছু আমাদের ফিতরাতের দিকটাকেই ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ সামাজিকতা এবং একে অপরের সাথে মত বিনিময়ের প্রতি উদ্‌গ্রীব থাকা আমাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। আলিমদের মুখে প্রচলিত الإنسان مدني بطبعه। 'মানুষ স্বভাবগতভাবেই সামাজিক জীব' এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।[১৮৭]

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন। মানব-অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। আর তাই ইসলাম এই সামাজিকতাকে অস্বীকার করে না। বরং সমাজের প্রত্যেকে সদস্যকে এই বিষয়ে পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। সামাজিকতার লাভ-ক্ষতি নির্ভর করে আল্লাহভীতির ওপর। কেউ কেউ আড্ডায় বা মজলিসে এমন সব কল্যাণকর ভূমিকা রাখে, যার দ্বারা সে আল্লাহর কাছে আরও উঁচু মাকাম অর্জন করে। জান্নাতের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। অপরদিকে কেউ হয়তো এই মজলিসে বসেই নিচু স্তরে নেমে যায়, পৌঁছে যায় জাহান্নামে। আমাদের মজলিসগুলো সাধারণ নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে :

১. আল্লাহকে স্মরণ হয়, নয়তো ভুলে যাওয়া হয়,

২. অন্যের সম্মান রক্ষা পায় কিংবা বিনষ্ট হয়,

৩. প্রতিভা প্রকাশিত হয়, অথবা তুচ্ছজ্ঞান করা হয়,

৪. উপদেশ মানা হয় কিংবা অস্বীকার করা হয়,

৫. পাপ অর্জন হয় কিংবা মুছে যায়,

[১৮৭] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৮/৬২

এভাবেই দিনশেষে জান্নাত নসিব হয় নতুবা জাহান্নাম।

আর সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, আমরা প্রতিদিনই এই ধরণের আড্ডায় অংশগ্রহণ করি; হয়তো দৈনিক দশ বারেরও বেশি! আসলে পুরো জীবনটাই এরকম মিটিং বা আড্ডায় ঘেরা। আমাদের কেউ-না-কেউ হয়তো কোনো আড্ডায় বসে আছে। কিছুক্ষণ পর কর্মক্ষেত্রে গিয়ে আরেক দফা বসবে। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে বসা হবে তৃতীয়বারের মতো। আবার সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে লগিং করার দ্বারা আমরা চতুর্থবারের মতো বসি। এভাবে চলতে থাকে বিরতিহীনভাবে। ঠিক এজন্যই সামাজিকতায় ইসলামি দিক-নির্দেশনাগুলো জানা একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। এটা জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়।

আজ আপনার সামনে এমন কিছু দিক-নির্দেশনা তুলে ধরতে চাই, যেন আজকের পর থেকে আমাদের কোনো মজলিস কিংবা আলোচনাই বৃথা না যায়। বরং এগুলো জান্নাতে পৌঁছোবার মাধ্যম হয়। আমরা এও আশা করি, দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি আলোচনা, প্রতিটি আড্ডা কাল হাশরের ময়দানে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

১) সালাম দিয়ে প্রবেশ করুন, সালাম দিয়েই বিদায় নিন

কীভাবে একটি মজলিসে অংশগ্রহণ করবেন, এ নিয়ে পদ্ধতির শেষ নেই। বিভিন্ন জন বিভিন্ন অভিবাদনের কথা বলবন। কিন্তু সালামের চেয়ে উত্তম অভিবাদন মিলবে না কোথাও।

রাসূল ﷺ বলেন,

إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ

> ‘তোমাদের কেউ মজলিসে উপস্থিত হলে যেন সালাম দেয় এবং মজলিস হতে বিদায়ের সময়ও যেন সালাম দেয়। শেষ সালাম প্রথম সালামের মতোই জরুরি।’[১৮৮]

এই হাদীস মেনে যে-কোনো মজলিসে অংশগ্রহণের দ্বারা আপনি এই কথাটিই প্রমাণ করেন—‘আমি এই বৈঠকে বসলাম শান্তির বার্তা নিয়ে। এখানে উপস্থিত কিংবা অনুপস্থিত কেউই আমার দ্বারা কোনো আঘাত পাবে না। বিদায়বেলাতেও শান্তির বার্তা রেখে আমি প্রস্থান করব।’

[১৮৮] মুসলিম : ৫২০৮

২) প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর স্মরণে কাটান

আলোচনার মজলিসে কেউই সর্বক্ষণ কথা বলে না। তা ছাড়া এমনটি করা প্রশংসনীয় কাজও নয়। তাই সাময়িক বিরতির মুহূর্তগুলো আল্লাহর যিকরে কাটান, পরকালের জন্য কিছু বিনিয়োগ করে ফেলুন।

রাসূল ﷺ বলেন,

ما من قومٍ جلسوا مجلسًا لم يذكروا اللهَ فيه إلا رأوْهُ حسرةً يومَ القيامةِ

'কোনো জাতি যদি বৈঠকে আল্লাহর যিকর না করে, তা হলে নিশ্চিত তাদের এই বৈঠক কিয়ামাতের দিন আফসোসের কারণ হবে।'[১৮৯]

রাসূল ﷺ-এর মন সর্বদা আল্লাহর সাথে জুড়ে থাকত। আর যারাই তাঁর সাথে বসেছে বিষয়টি লক্ষ্য করেছে, প্রত্যেক বিরতিতে নবিজির ঠোঁট আল্লাহর যিকরে নড়ছে। আবদুল্লাহ ইবনু উমর رضي الله عنه এমনটাই দেখেছেন :

كُنَّا نَعُدُّ لرسولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فى المَجْلِسِ الواحِدِ مِئَةَ مَرَّةٍ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

'আমরা গণনা করে দেখলাম এক বৈঠকেই আল্লাহর রাসূল ﷺ এক শ বার বললেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

'ও আমার রব, আমাকে মাফ করুন, আমার তাওবা কবুল করুন। অবশ্যই আপনি তাওবা কবুলকারী এবং অত্যন্ত দয়াময়।'[১৯০]

আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকার মানে এই নয়—মজলিসে গিয়ে ধ্যান ধরে বসে হবে, কারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। এজন্য আমাদের তৃতীয় দিক-নির্দেশনা :

৩) প্রত্যেকের প্রতি মনোযোগী হন

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ একটি আংটি বানিয়ে নিয়েছিলেন, সেটি পড়ে থাকতেন। পরবর্তীকালে তিনি সাহাবিদের বলেন,

---

[১৮৯] সহীহ ইবনু হিব্বান, ৮৫৩
[১৯০] আবূ দাউদ, ১৫১৬; সহীহ

شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ، إِلَيْهِ نَظْرَةٌ، وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ

'আজ এই আংটি আমাকে তোমাদের থেকে গাফেল করে দিয়েছে। একবার আমি এর দিকে তাকাই, আরেকবার তোমাদের দিকে।' অতঃপর রাসূল ﷺ সেই আংটি ফেলে দিলেন।[১১১]

আলোচনা চলাকালে আপনার মোবাইল দূরে রাখুন। ল্যাপটপ বন্ধ করে দিন। আইপ্যাড একপাশে সরিয়ে রাখুন। আরও যতকিছু আছে মনোযোগ ছিনিয়ে নিতে পারে, সব সরিয়ে রাখুন। বিশেষ করে মা এবং বাবা এবং পরিবারের সাথে বসার সময় এসব যেন আপনার মনোযোগ ছিনিয়ে না নেয়, সে ব্যবস্থা করুন।

৪) সাহস নিয়ে অন্যের সংশোধন করুন

আলোচনার শুরুটা হয়তো ভালো কথা দিয়েই হয়েছিল, কিংবা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে এর মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে যেতে থাকল। একপর্যায়ে তা পাপের কারণ হয়ে গেল! এই মোড় পরিবর্তন হতে পারে গীবত, দ্বীন নিয়ে হাসি-তামাশা করা, কিংবা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা, অনিশ্চিত বা যাচাই ছাড়া কোনো বিষয়ে আলোচনা করা, কিংবা কুদৃষ্টি দেওয়া, মাদক-সেবন, অথবা সালাতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়া। এই ধরণের অনেক কিছুই হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে আপনার কাজ হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে মার্জিত ভাষায় নসিহত করা। আর এতে যদি কাজ না হয়, তা হলে সেই বৈঠক পরিহার করা। এটিই সর্বোত্তম। কিন্তু আপনি যদি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন, চুপচাপ দেখে যান তাদের অন্যায়গুলো, তা হলে আল্লাহর কাছে আপনিও তাদের মতোই সমান দোষী সাব্যস্ত হবেন।

আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

'আর হে মুহাম্মাদ, যখন তুমি দেখো, লোকেরা আমার আয়াতের মধ্যে দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন তাদের কাছ থেকে সরে যাও, যে পর্যন্ত না তারা এ আলোচনা বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়।'[১১২]

---

[১১১] নাসাঈ, ৫২৮৯
[১১২] সূরা আনআম, ৬ : ৬৮

অন্য এক আয়াতে আরও কঠিন ভাষায় সাবধান করা হয়েছে :

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

'আর আল্লাহ্ এই কিতাবে তোমাদের পূর্বেই হুকুম দিয়েছে—যেখানে তোমরা আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরি কথা ও তাঁর প্রতি বিদ্রুপ করতে করতে শুনবে, সেখানে বসবে না; যতক্ষণ না লোকেরা অন্য প্রসঙ্গে ফিরে আসে।'[১৯৩]

পাপে অংশগ্রহণ করা আর পাপের স্থানে চুপটি মেরে বসে থাকা একই কথা। এজন্য ইমাম কুরতুবী ﷺ ওপরের আয়াতের তাফসীরে বলেন,

فكل من جلس في مجلس معصية، ولم ينكر عليهم، يكون معهم في الوزر سواء

'কেউ যদি কোনো পাপের আড্ডায় বসে এবং তাদের প্রতিবাদ করতে ব্যর্থ হয়, তবে পাপের দিক থেকে তারা সবাই সমান।'[১৯৪]

ইবরাহীম নাখঈ ﷺ বলেন,

إنّ الرجل ليجلس فيتكلم بالكلمة، فيرضى الله بها، فتصيبُه الرحمة فتعمُّ من حوله، وإن الرجل ليجلس في المجلس، فيتكلم بالكلمة، فيسخط الله بها، فيصيبه السّخط، فيعمّ من حوله

'এক লোক এক মজলিসে বসল, এবং এমন কথা বলল যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। ফলে তার ওপর রহমত বর্ষিত হয় এবং তার সাথে-বসা সকলের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। অপরদিকে আরেক লোক হয়তো মজলিসে বসে এমন কথা বলল, যা আল্লাহর ক্রোধের কারণ হলো। ফলে তার ওপর ক্রোধ বর্ষিত হয় এবং তার সাথে বসা বাকিরাও এই ক্রোধের মধ্যে পড়ে।'[১৯৫]

৫) গোপন কথা বলতে মানা

অন্যের গোপন কথা বলে বেড়ানোর স্বভাব আমাদের একটু বেশিই। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীরা আড্ডা দেবার সময় কে কী বলেছে তা সূক্ষ্মভাবে একে অপরকে বলে দেয়। অথচ

---

[১৯৩] সূরা আন-নিসা, ৪ : ১৪০
[১৯৪] তাফসীর আল-কুরতুবী, ৫/৪১৮
[১৯৫] ইবনুল জাওযী, যাদুল-মাসির, ১/৪৮৮

যাদের গোপনীয়তা আমরা ফাঁস করে দিলাম, তারা আমাদেরকে বিশ্বাস করেই কথাগুলো শেয়ার করেছিল। আমরা তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করলাম। আর বন্ধুকে এটা বলার মানে হয় না 'এই কথা কাউকে বলবি না।' কারণ, একজনের কথা অন্য জনকে না বলাটাই তো স্বাভাবিক হওয়ার কথা। অনুরোধ করতে হবে কেন?

রাসূল ﷺ বলেন,

الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ

অর্থাৎ 'মজলিস আমানতের অন্তর্ভুক্ত।'[১১৬]

আনমনে আপনার মুখে যা এল বলে দিলেন, অথচ সে বিষয়টিই অন্য কারও চোখে বিশাল সমস্যার কারণ হতে পারে। আলোচনায় সর্বদা এমন গোপন কথা বলার দরকার নেই। যখন বুঝা যাচ্ছে এসব প্রকাশ করে সত্যিকারার্থে কোনো ফায়দা নেই, তখন গোপন কথা ফাঁস করারও প্রয়োজন নেই।

৬) উত্তম-সঙ্গ নির্বাচন করুন

কত মানুষ যে স্রেফ সঙ্গীর কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহই ভালো জানেন। তদ্রূপ কত মানুষ যে শুধুমাত্র সঙ্গীর কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, আল্লাহই ভালো জানেন। সঙ্গী বাছাইয়ের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, হাশরের ময়দানে অনেকেই তার পরিণতির জন্য বন্ধুদের দায়ী করবে।

আল্লাহ বলেন,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

'আর সেদিন জালিম নিজের হাত দুটো কামড়িয়ে বলবে, "হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোনো পথ অবলম্বন করতাম!" "হায় আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।"'[১১৭]

জীবনে সবকিছুর মানদণ্ড সব সময় এক রকম থাকে না। রকমারি খাবার, খেলাধুলা, দাওয়াহ, জ্ঞানার্জন, ইবাদাত, মানুষের সাথে ওঠাবসা করা—সবকিছুরই প্রভাব জীবনে

---

[১১৬] আবু দাউদ, ৪৮৬৯
[১১৭] সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৬-১৭

পড়ে। আপনি অনুধাবন করতে পারেন কিংবা না পারেন, আপনার সঙ্গীসাথিদের ভালো লাগার বিষয়গুলো সময়ের ব্যবধানে একদিন আপনারও ভালো লাগায় পরিণত হবে।

এজন্য আমাদের পূর্বসূরিগণ সঙ্গ-গ্রহণের ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। বিশেষ করে নতুন কোনো শহরে গেলে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। তাবিয়ি আলকমা ﷺ বলেন,

قدمت الشأم فصليت ركعتين ثم قلت : اللهم يسر لى جليسا صالحا فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبى قلت : من هذا ؟ قالوا أبو الدرداء

> 'আমি শাম (বৃহত্তর সিরিয়া) শহরে পৌঁছে সেখানে দু রাকআত সালাত আদায় করলাম। এরপর দুআ করলাম, "আল্লাহ, আমার জন্য নেক মজলিস (খুঁজে পাওয়া) সহজ করে দিন।' দুআ শেষ করে এক বৈঠকে গিয়ে বসে পড়লাম। সেখানে একজন শাইখ এলেন। আমার কাছাকাছি বসলেন তিনি। আমি জানতে চাইলাম, উনি কে। লোকেরা বলল, উনি রাসূল ﷺ-এর সাহাবি আবুদ দারদা ﷺ।'[১৯৮]

একইভাবে হুরাইস ইবনু কাবীসা ﷺ বলেন,

قدمت المدينة فقلت : اللهم يسر لى جليسا صالحا ، قال فجلست إلى أبى هريرة

> 'আমি মদীনায় পৌঁছে দুআ করলাম, "আল্লাহ, আমার জন্য নেক বৈঠক সহজ করে দিন।" ফলে আবূ হুরায়রা ﷺ-এর মজলিসে বসার তাওফীক পেয়ে গেলাম।'[১৯৯]

আসলে আমাদের সালাফগণ নিম্নোক্ত হাদীসটির আসল মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন :

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

> 'ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন খেয়াল করে সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে।'[২০০]

---

[১৯৮] বুখারি, ৩৭৮৭
[১৯৯] তিরমিযি, ৪১৩
[২০০] তিরমিযি, ২৩৭৮

আর এটা কোনো অজুহাত হতে পারে না যে, বর্তমানে মুত্তাকী, পরকাল-অভিমুখী লোক নেই। আপনার কাজ হলো ইখলাসের সাথে আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চাওয়া, যেন তিনি আপনাকে তাদের নিকটবর্তী করে দেন। এবং তাদেরকেও আপনার কাছে পৌঁছে দেন।

৭) উপকারী কথাই শুধু বলুন

কী বলছেন এবং কীভাবে বলছেন—এর ওপর অনেক ফলাফল নির্ভর করছে, এরকম পরিস্থিতিতে আপনি প্রায়ই পড়বেন। আপনার কথা যেমন দুনিয়া সাজায়, তেমনি সাজায় আখিরাতের জীবন।

আর তাই রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

> 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামাত-দিবসের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।'[২০১]

মনের ভাব প্রকাশে কথা বলা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে খুব দ্রুত মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। মুখের ওপর লাগাম পরানোর অর্থ হলো, নিজের বদ-অভ্যাসের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আর আল্লাহ যে আপনাকে দেখছেন, এটার ওপরও আপনার বিশ্বাস আছে। তাই তো কথা বলার সময় আপনি সচেতন হচ্ছেন। কী বলতে যাচ্ছেন, তা বলার আগে যাচাই করে নিচ্ছেন।

'আমি কোনো অকল্যাণকর কথা বলব না'—যে ব্যক্তি নিজের জীবনে এটি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, তার ব্যক্তিগত-সমস্যা, সামাজিক-সমস্যা, সর্বোপরি আখিরাত-কেন্দ্রিক সমস্যা এবং বিপদাপদ আগেভাগেই দূর হয়ে যাবে বিইজনিল্লাহ।

৮) রসিকতা আর বিদ্রুপ এক নয়

مُزَاحَةٌ অর্থাৎ রসিকতার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশ কিছুটা হালকা করা এবং উপস্থিত জনতার মধ্যে আনন্দের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু এটা যদি সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেবার উপক্রম হয় কিংবা কাউকে দুঃখ পৌঁছায়, তখন সেটা আর রসিকতা থাকে না, বরং سُخْرِيَةٌ অর্থাৎ উপহাস-বিদ্রুপে পরিণত হয়। আর আল্লাহ এ ধরণের কাজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

[২০১] বুখারি, ৬২০৮

করেছেন। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

‘ঈমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে সে বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা কোরো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতই-না নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো জালিম।’[২০২]

যাকে নিয়ে মজা করা হচ্ছে, সে হয়তো আমাদের কথায় মুখ ফুটে হাসছে। কিছু বলছে না। এর মানে কিন্তু এই নয়, সে আমাদের উপহাস ভালোভাবে নিয়েছে বা মন থেকে গ্রহণ করেছে। বরং হাসি দ্বারা হয়তো প্রচণ্ড আঘাত সে আড়াল করতে চাইছে। কবির ভাষায় :

وَلَرُبَّمَا خَزَنَ الْكَرِيمُ لِسَانَهُ ... حَذَرَ الْجَوَابِ وَإِنَّهُ لَمُفَوَّهُ

وَلَرُبَّمَا ابْتَسَمَ الْكَرِيمُ مِنَ الْأَذَى ... وَفُؤَادُهُ مِنْ حَرِّهِ يَتَأَوَّهُ

‘কখনও কখনও সম্মানিত ব্যক্তি চুপ থাকে
উত্তর দেবার ভয়ে যদিও-বা সে পারদর্শী বাগ্‌বিতণ্ডায়।
কখনও কখনও সম্মানিত ব্যক্তি মুচকি হাসে,
যদিও-বা অন্তরটা পুড়ে যাচ্ছে কষ্ট যাতনায়।’[২০৩]

একদিন নবিজি ﷺ-কে রসিকতা করতে দেখে সাহাবিগণ প্রশ্ন করলেন :

يا رسولَ اللهِ ! إنَّكَ تداعِبُنا ؟

‘আল্লাহর রাসূল, আপনিও আমাদের সাথে রসিকতায় অংশগ্রহণ করছেন?’

---

[২০২] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১১
[২০৩] শুআবুল ঈমান, ৯৬২৫

তিনি উত্তরে বললে,

إِنِّي لا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا

'তবে আমি শুধু সত্য কথাই বলি।'[২০৪]

নবিজি রসিকতার সাথে উপহাস গুলিয়ে ফেলতেন না। শ্রোতার মানসিকতার জন্য ক্ষতিকর কিছু বলতেন না তিনি। তাঁর মধ্যে ছিল না মিথ্যাবাদিতা কিংবা কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার করার স্বভাব। তেমনি তাঁর রসিকতা মাত্রাতিরিক্ত হতো না।

৯) সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করুন

যৌবনকালে কখনও অপমানিত হলে, তা আমাদের সব সময় তাড়া করে বেড়ায়। তেমনিভাবে প্রেরণাদায়ক মুহূর্তগুলো এবং উৎসাহ-প্রদানকারী কথাগুলোও আমরা ভুলতে পারি না। আর তাই আপনি যখন কোনো বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন, চেষ্টা করবেন উপস্থিত জনতার সুপ্ত প্রতিভাগুলো বিকশিত করতে। উৎসাহ দেবেন এবং তাদের প্রতিভাগুলো বেঁধে দেবেন পরকালের সুতোয়। অর্থাৎ কীভাবে তারা এই গুণ কাজে লাগিয়ে জান্নাত-পানে ছুটে যেতে পারে, সে ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করবেন।

ইতিহাসের পাতায় এমন মহৎ ব্যক্তি অনেক, যাদের জীবনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল স্রেফ একটি উক্তি থেকে। হ্যাঁ, মজলিসের একটি কথাই তাদের গোটা জীবন পাল্টে দিয়েছিল। দুটো উদাহরণ দিই :

সাধারণ একটি বৈঠক চলছিল। উপস্থিত জনতা একে অপরের সাথে মত বিনিময় করছিল সেখানে। ইমাম যাহাবি ﷺ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ শাইখ বিরযালি ﷺ ইমাম যাহাবি ﷺ-কে ডেকে বললেন,

إن خطك يشبه خط المحدثين

'তোমার হাতের লেখা হাদীস-বিশারদদের মতো।'

এই কথাটিই যাহাবি ﷺ-এর জীবনের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে যাহাবি ﷺ বলেন,

فحبب الله إليّ علم الحديث

[২০৪] তিরমিযি, ১৯৯০

'সেদিন থেকে আল্লাহ্ তাআলা আমার অন্তরে হাদীসশাস্ত্রের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দিলেন।'[২০৫]

পরবর্তী জীবনে তিনি ইলমের ময়দানের বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং এমন অসংখ্য বই রচনা করেন যেগুলো ছাড়া আজ আমরা লাইব্রেরি তৈরির কথা কল্পনাও করতে পারি না।

তেমনিভাবে একটি সাধারণ মন্তব্য ইমাম বুখারি ﷺ-কে হাদীস সংকলন করতে উৎসাহ প্রদান করে। আজ তার সংকলিত 'সহীহ বুখারি' সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ। ইমাম বুখারি ﷺ-এর ভাষ্যমতে এর শুরুটা যেভাবে হয়েছিল :

كنّا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح

'আমরা ইসহাক ইবনু রাহাউইহ ﷺ-এর দারসে বসে ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমরা যদি নবিজি ﷺ-এর বিশুদ্ধ সুন্নাহ নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত হাদীস-গ্রন্থ সংকলন করতে!"' ইমাম বুখারি ﷺ বলেন, 'তাৎক্ষণিক আমার মনে এই কাজ করার ইচ্ছা উদয় হলো। সেদিন থেকেই আমি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের যাত্রা শুরু করি।'[২০৬]

বলে রাখা ভালো, ইমাম বুখারি ﷺ যখন এই কাজ শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর। সেদিন থেকে পরবর্তী ১৬ বছর তিনি এই সহীহ বুখারির পেছনেই ব্যয় করেন।

আপনি হয়তো কোনো-এক বৈঠকে অনুপ্রেরণাদায়ক কিছু কথা বললেন। কিন্তু দেখা গেল, আপনার সেই কথাগুলো কারও অন্তরে গিয়ে বিঁধেছে। আপনার কথার দ্বারাই পাল্টে গেছে তার পুরো জীবন। আমূল পরিবর্তন হয়েছে তার দৃষ্টিভঙ্গির। দিনশেষে তার অর্জিত সাওয়াবের ভাগীদার আপনিও হবেন ইন শা আল্লাহ।

১০) দুআ দ্বারা শেষ করুন

আমাদের অভিজ্ঞতা বলে সব আলোচনার পরিসমাপ্তি ভালো কিছু দিয়ে হয় না। গুরুত্বপূর্ণ কথা থেকে অহেতুক আড্ডার দিকে গড়ায়। তারপর রাগের মাথায় গলার স্বর উচু হয়ে

[২০৫] সিয়ার, ১/৩৬
[২০৬] তাদরীবুর রাবী, ১/৮৮

যাওয়া, খারাপ শব্দ ব্যবহার করা, দুনিয়াবি আলোচনায় ডুবে যাওয়া, কিংবা খুব বেশি-মাত্রায় ঠাট্টা মশকরা করা—এভাবে বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়।

আমি নিশ্চিত, এরকম কোনো আড্ডা থেকে কেটে পড়তে আপনি খুব উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের এই অধ্যায়ের সর্বশেষ নির্দেশিকা আপনার অস্থিরতা দূর করতে এবং অন্তরের প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বিইজনিল্লাহ।

রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ جَلَسَ فِى مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِى مَجْلِسِهِ ذَلِكَ

'কেউ এমন বৈঠকে বসল যেখানে (অহেতুক) শোরগোল বেড়ে গেল, কিন্তু প্রস্থানের পূর্বে সে যদি বলে,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"আল্লাহ, আপনি বড়োই পবিত্র, আপনার জন্যই প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি এবং আপনার কাছে তাওবা করছি।"

তা হলে সেই বৈঠকে-হওয়া যাবতীয় গুনাহ থেকে সেই ব্যক্তি ক্ষমা পেয়ে যাবে।'[২০৭]

এ থেকেই বোঝা যায় কেন রাসূল ﷺ-এর জিহ্বায় সর্বদা ওপরের দুআটি লেগেই থাকত। আমাদের মা আয়িশা رضي الله عنها বলেন,

" مَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا قَطُّ ، وَلَا تَلَا قُرْآنًا، وَلَا صَلَّى صَلَاةً ، إِلَّا خَتَمَ ذَلِكَ بِكَلِمَاتٍ"

'এমন কোনো বৈঠক নেই, তিলাওয়াত নেই, সালাত নেই, যা শেষ করার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ এই দুআ পড়তেন না।'[২০৮]

---

[২০৭] তিরমিযি, ৩৪৩৩

[২০৮] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ১০০৬৭

এই যদি হয় রাসূল ﷺ এর ইতি টানা, অথচ যারা তাঁর সঙ্গ গ্রহণ করত, তারা ছিল নির্ভেজাল যিকরকারী এবং সর্বদা আল্লাহর প্রশংসাকারী। তা হলে আমার আপনার বৈঠকের সমাপ্তি কেমন হওয়া উচিত!

রেস্টুরেন্টের টেবিল থেকে ওঠার সময়, পরিবারের সাথে সন্ধ্যার বৈঠক শেষে, কিংবা সামাজিক মাধ্যমে করা চ্যাট করার পর—আল্লাহর রাসূলের হারিয়ে-যাওয়া এই সুন্নাহ পুনরুজ্জীবিত করুন এবং অন্যদেরও করতে উৎসাহিত করুন।

সবশেষে আদবের অনেক বিষয় রয়ে গেছে যা আমি উল্লেখ করতে পারিনি। আশা করি পাঠক ব্যক্তিগত তাগিদে সেগুলো জেনে নেবেন। তবে পুরো লেখাটির মূল উপপাদ্য ছিল দ্বীন ইসলামের সৌন্দর্য বোঝানো। ইসলাম আমাদেরকে কোনো বিষয়েই অজ্ঞতার অন্ধকারে ফেলে রাখে না। যে ব্যক্তি মনে-প্রাণে আল্লাহকে চায় এবং চায় জান্নাতে একটি ঘর বানাতে, তাকে জীবনের পরতে পরতে নিখুঁত পথনির্দেশ প্রদান করে ইসলাম।

অধ্যায়টি কেবল বৈঠকের আদবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং মুখের ওপর লাগাম, দৃষ্টি অবনত, আল্লাহর যিকরের গুরুত্ব, মানুষের সম্মান রক্ষা করা, দুআ, আমানত রক্ষা করা, ভালো কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা, এ ছাড়া আরও অনেক কিছুই উদ্দেশ্য ছিল। এগুলো সব আমাদের আড্ডা কিংবা মজলিসেরই অংশ। আর সত্যি বলতে কী। জীবনটা স্রেফ কিছু বৈঠকেরই সমষ্টি।

ও আল্লাহ, আজকের পর থেকে আমাদের সকল বৈঠক, সকল আলোচনা, আড্ডাকে তুমি জান্নাতে প্রবেশের ওসীলা বানিয়ে দিয়ো!

আমি সবাইকে মাফ করে দিয়েছি

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে যত আলোচনা করা হয়, অধিকাংশ আলোচনা থাকে তাঁর জ্ঞান-সমুদ্র, নির্ভয় মনোবল, সাহসিকতা আর বাগ্মিতা নিয়ে। কিংবা প্রখর স্মৃতিশক্তি, জিহাদের ময়দানে বীরদীপ্ত চরিত্র নিয়ে। অথবা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের ব্যাপারে তিনি কতটা সোচ্চার ছিলেন—এই বিষয়গুলোর মধ্যেই সাধারণত আলোচনা ঘুরপাক খায়। কিন্তু বিস্ময়ভরা এই মহান ব্যক্তির জীবনের সৌন্দর্যমণ্ডিত আরেকটি দিক আলোচনায় বাদ পড়ে যায়। এমন একটি দিক, যা অন্য যে-কোনো সময়ের তুলনায় আজকের দিনে মুসলিম উম্মাহর খুব জন্য বেশি প্রয়োজন।

তাঁর ব্যক্তিত্বের সেই দিকটি হলো 'ক্ষমাশীলতা'। ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর জীবনের অন্যতম একটি শ্লোগান ছিল :

أحللت كل مسلم عن إيذائه لي

'যত মুসলিম আমাকে কষ্ট দিয়েছে, আমি সবাইকে মাফ করে দিয়েছি।'[২০১]

সত্যিই, এ ধরণের অভিব্যক্তি মুখে বলা সহজ, আমল করা কঠিন। কিন্তু তিনি এই কথার ওপর যেভাবে আমল করতেন, সেটাও ছিল বিস্ময়কর। 'সবাইকে মাফ করে দিয়েছি' এই কথাটা এখন ফটোশপ দিয়ে সুন্দর মডেল দাঁড় করার মতো বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। ফেসবুকে বলুন আর টুইটার, যেখানে-সেখানে এগুলো চোখে পড়ে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়নের বেলায় অধিকাংশ মানুষেরই পদস্খলন ঘটে।

দেখা যাক, ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ সত্যিকারার্থে কতটা অবিচল ছিলেন নিজের বক্তব্যে।

---

[২০১] মানহাজু ইবনি তাইমিয়্যা, ২৩১

ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আলি ইবনু ইয়াকূব বাকরি সূফির ঘটনা :

'আল-ইস্তিগাছা' নামে ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর একটি বই আছে। এর বিষয়বস্তু দুআ দ্বারা সাহায্য চাওয়া। এটি অ্যাকাডেমিক পদ্ধতিতে লেখা বই। অর্থাৎ প্রতিটি কথা দলিলসহ পাবেন। আলি বাকরি তাঁর লেখার ভুল খণ্ডনোর পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে ফাতওয়া জারি করল। সে বলল, ইবনু তাইমিয়্যা কাফির হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, নানাভাবে ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর সম্মানহানীর অপচেষ্টা চালাল সে। আর রাষ্ট্রের কানে মন্ত্র দিল তাঁকে বন্দি করার জন্য। ফলে ৭০৭ হিজরিতে ক্ষমতাসীনরা তাঁকে বন্দি করার সিদ্ধান্ত নিল। তখন সেই আলি বাকরিই জোরাজুরি করতে লাগল, যেন ইবনু তাইমিয়্যা-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়!

ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর ওপর পরীক্ষার মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। ৭১১ হিজরিতে আলি বাকরির উস্কে-দেওয়া একদল উগ্র সুফি পথিমধ্যে ইবনু তাইমিয়্যার পিছু নিল। তারা তাকে কোণঠাসা করে বেধর মারপিট করল। এরূপ আকস্মিক আক্রমণ তাঁর সাথে একাধিকবার ঘটেছে। তারপর যখন ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর কল্যাণকামী ব্যক্তিবর্গ আসল সত্যতা জানতে পারল, তখন তারা আলি বাকরিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য ওঠেপড়ে লাগল। সুবহানাল্লাহ, সময় যতই গড়াতে থাকল স্বয়ং রাষ্ট্রপক্ষ এবার আলি বাকরির খোঁজ শুরু করে দিল। এখন সে নিজেই দৌড়ের ওপর!

আলি বাকরিকে গ্রেপ্তার করা হলো। রাষ্ট্র এবার ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর কাছে জানতে চাইল, তাকে কী শাস্তি দেওয়া উচিত? কেমন শাস্তি দিলে আপনি খুশি হবেন? দীর্ঘদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার এটাই ছিল মোক্ষম সময়। কিন্তু ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ সেদিন উত্তরে যা বললেন, সত্যিই অবাক করার মতো। তিনি বললেন,

أنا ما أنتصر لنفسي

'আমি নিজের জন্য প্রতিশোধ নিই না।'

কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারল না। তাকে জোরাজুরি করতে থাকল প্রতিশোধ নেবার জন্য। তখন তিনি বাধ্য হয়ে বলেন,

"إما أن يكون الحق لي، أو لكم، أو لله ، فإن كان الحق لي فهم في حل، وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني فلا تستفتوني؛ وافعلوا ما شئتم، وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه كما يشاء ومتى يشاء".

'আপনারা (শাস্তি দেবার) যে অধিকারের কথা বলছেন, হয় সেই অধিকার আমার, আপনাদের, নয়তো আল্লাহর। এখন সেই অধিকার যদি আমার হয়, তা হলে (জেনে রাখুন) আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি। আর যদি আপনাদের হয়, তা হলে আমার কাছে কোনো ফয়সালা চাইবেন না। আপনাদের যা মনে চায় করুন। আর (শাস্তি দেবার) অধিকার যদি আল্লাহর হয়, তা হলে তিনি নিজেই তাঁর হক আদায় করবেন, এবং যখন ইচ্ছে যেভাবে ইচ্ছে করবেন।'

তা সত্ত্বেও রাষ্ট্র আলি বাকরিকে এভাবে ছেড়ে দিতে নারাজ। এরপর আলি বাকরিকে যখন রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত জানানো হলে, তখন তিনি কোথায় লুকিয়েছিল জানেন? সে মিশরে চলে যায় এবং শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর বাড়িতেই আশ্রয় নেয়! যাকে হত্যার জন্য এতকাল ছক এঁকেছিল, তার বাড়িতেই আশ্রয় নেয় সে। আর ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-ও সেই শত্রুর পক্ষ হয়ে আবেদন করলেন এবং রাষ্ট্রকে অনুরোধ করলেন আলি বাকরির মামলা নিষ্পত্তির জন্য।

এভাবে হিংসুকদের মিথ্যাচারের কারণে ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ বহুবার জেল খেটেছেন। বরাবরের মতো বিতর্কে যখন তারা হেরে যেত, তখন কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে রাগে ক্ষোভে ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে উস্কে দিত। ফলে তাঁকে কারাবন্দি করা হতো এবং ভোগ করতে হতো অপরাধ ছাড়া নির্দয় শাস্তি। এই নিকৃষ্ট কাজগুলোর অন্যতম খলনায়ক ছিল নাসর মিনবাজি, আমীর রুকনুদ্দীন (মিনবাজির ছাত্র), এ ছাড়া তৎকালীন আরও অনেক ফকীহ এবং আলিম-ওলামা। তারা সে সময়কার সুলতানের তোষামোদ করত, যে কিনা পূর্বের সুলতানকে হটিয়ে গদি দখল করেছিল।

একপর্যায়ে পূর্বের সুলতান নাসির কালাউন পুনরায় ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হন। তারপর অনতিবিলম্বে ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-কে মুক্ত করে দেন। তাঁকে সম্মানিত করেন এবং রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান। তিনি সেখানে গেলে তাঁকে দেখামাত্রই সুলতান দাঁড়িয়ে যান এবং শাইখুল ইসলামকে অনেক সম্মান-প্রদর্শন করেন। এরপর তিনি ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর সাথে একান্ত বৈঠকে বসেন। এবং ক্ষমতা থেকে নামাতে যারা তার বিরুদ্ধে ভূমিকা রেখেছিল, সেই-সকল ফকিহ ও আলিমদের মৃত্যুদণ্ড দেবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। এরপর তিনি ইবনু তাইমিয়্যাকে অনুরোধ করেন তার উদ্দেশ্য বিবেচনায় নিতে। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন—এই আলিমরা অতীতে তাঁর বিরুদ্ধে কী কী করেছিল। কিন্তু ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ ঊর্ধ্বজগতের মানুষ ছিলেন। সুযোগের সদ্ব্যবহারের বদলে তিনি তাদের প্রশংসা শুরু করে দিলেন। এবং বললেন, তাদের যেন কোনো ক্ষতি করা না হয়। সাথে সাথে এটাও বলে দিলেন,

إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء الأفاضل

'আপনি যদি তাদের হত্যা করেন, তা হলে তাদের মতো আর কাউকে পাবেন না।'

সুলতান উত্তরে বলেন,

لكنهم آذوك وأرادوا قتلك مرارا ؟

'তারা আপনাকে কষ্ট দিয়েছে! হত্যার চেষ্টা করেছে! এর পরেও এসব বলছেন!?'

ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ বলেন,

من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي

'যে আমাকে কষ্ট দেয়, আমি তাকে মাফ করে দিই। আর যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহই তাকে শাস্তি দেবেন। আমি নিজের জন্য প্রতিশোধ নিই না।'

ইবনু তাইমিয়্যাকে রাজি করানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেন সুলতান। কিন্তু তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় মতে অটল রইলেন, যতক্ষণ না সুলতান সবাইকে মাফ করে দিলেন।[২১০]

সুলতানের ক্ষমাপ্রাপ্ত সেই আলিমদের একজন কাদি ইবনু মাখলূফ মালিকি। এই ঘটনার পর তিনি বিস্ময়সুরে বলেছিলেন,

ما رأينا مثل ابن تيمية ، حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا

'সত্যিই, ইবনু তাইমিয়্যার মতো কাউকে দেখিনি। আমরা তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে প্ররোচিত করে ব্যর্থ হলাম। আর সে আমাদের ওপর ক্ষমতা লাভ করেও ক্ষমা করে দিলেন এবং আমাদের পক্ষ নিয়ে উল্টো সুলতানের সাথে তর্ক করলেন!'[২১১]

ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ আরও একটি বিখ্যাত উক্তি ছিল :

"فَلَا أُحِبُّ أَنْ يُنْتَصَرَ مِنْ أَحَدٍ بِسَبَبِ كَذِبِهِ عَلَيَّ، أَوْ ظُلْمِهِ، وَعُدْوَانِهِ، فَإِنِّي قَدْ أَحْلَلْتُ كُلَّ مُسْلِمٍ، وَأَنَا أُحِبُّ الْخَيْرَ لِكُلِّ الْمُسْلِمِينَ، وَأُرِيدُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ الْخَيْرِ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي. وَالَّذِينَ كَذَبُوا وَظَلَمُوا فَهُمْ فِي حِلٍّ مِنْ جِهَتِي الفتاوى

---

[২১০] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৪/৬০-৬১

[২১১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৪/৬১

'আমার ওপর মিথ্যারোপের কারণে কারও প্রতিশোধ নেব—এটা পছন্দ করি না। সে জুলুম কিংবা শত্রুতা, যা-ই করুক না কেন। অবশ্যই মুসলিম-মাত্র সবাইকে মাফ করে দিয়েছি। আর আমি সকল মুসলিমদের জন্য কল্যাণ পছন্দ করি। নিজের জন্য যা পছন্দ করি, প্রত্যেক মুমিনের জন্য সেটাই পছন্দ করি। যারা মিথ্যা বলেছে, জুলুম করেছে, তারা সবাই আমার দিক থেকে মুক্ত।'[২১২]

বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? কেননা আমাদের অতীত পঙ্কিলতা মুক্ত নয়। এখনও প্রতিনিয়ত অনেক গুনাহ হয়ে যাচ্ছে। আর তাই এমন কেউ তো অবশ্যই আছে যাদের প্রতি আমরা অন্যায় করেছি। আল্লাহর ক্ষমা-লাভের আগে তাদের ক্ষমা অর্জন করা প্রথম শর্ত। তেমনিভাবে অন্যদের প্রতিও আমাদের এরূপ আচরণ প্রদর্শন উচিত, যা আমরা নিজেদের বেলায় আশা করি। মানুষদের মাফ করে দেওয়া উচিত, কারণ, অন্যদের ক্ষেত্রে আমরা মাফ পাওয়ার আশা রাখি।

'তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দেন?'[২১৩]

আমরা যদি আন্তরিক হই, তা হলে তাৎক্ষণিক সংশোধন করে নেওয়ার জন্য এই একটি আয়াতই যথেষ্ট, অন্যদের মাফ করে দিতে এবং পুনরায় সালাম প্রসার করার জন্য।

আপনি কি জানেন, আয়াতটি শোনার পর আবূ বকর ﵁-এর অনুভূতি কেমন ছিল? তিনি অঝরে কেঁদেছিলেন এবং যে লোক তাঁর প্রতি জুলুম করেছিল, তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সে ছিল তাঁর আপন চাচাতো ভাই মিসতাহ ইবনু উছাছা ﵁; একজন গরীব হিজরতকারী সাহাবি। আবূ বকর ﵁ তার যাবতীয় খরচাপাতি বহন করতেন। যেদিন আমাদের মা আয়িশা ﵂-এর নামে কুৎসা রটানো হলো, শহরের দিগ্‌বিদিক ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। খুব কম-সংখ্যক সাহাবি মা আয়িশা ﵂-এর ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন সেদিন। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তাআলা সূরা নূরের আয়াতগুলো নাযিল করে মুনাফিকদের-রটানো সেই কলঙ্ক থেকে উম্মুল মুমিনীনকে নিষ্পাপ ঘোষণা করলেন। এ সময়ে আয়িশা ﵂-এর ব্যাপারে মিসতার বক্তব্যের কারণে আবূ বকর ﵁ তার ওপর ক্ষিপ্ত হোন এবং কসম কাটেন তিনি আর কখনও মিসতারের পেছনে টাকা ঢালবেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আবূ বকর ﵁-কে উদ্দেশ্য করে আয়াত নাযিল করলেন,

'আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন কসম না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের, মিসকীনদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষক্রটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি

---

[২১২] মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৮/৫৫
[২১৩] সূরা আন-নূর, ২৪ : ২২

পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[২১৪]

আয়াতটি সরাসরি আবূ বকর ﵁-এর বুকে গিয়ে বিঁধল। তিনি অশ্রু ধরে রাখতে পারলেন না। বললেন, 'অবশ্যই চাই, আমাকে আপনি মাফ করে দিন!' তিনি দ্রুত ছুটে যান মিসতাহ এবং তার পরিবারের কাছে। সংকল্প প্রকাশ করেন তিনি কখনোই খরচ দেওয়া বন্ধ করবেন না।

আবূ বকর ﵁ আয়াতটি এভাবেই নিয়েছিলেন। আস-সিদ্দীক আল-আকবার। এটাই ছিল তাঁর চরিত্র। নবি-রাসূলদের পর পৃথিবীর-বুকে-বিচরণ-করা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিও চাইতেন আল্লাহ তাকে মাফ করে দিক। মাওলার ক্ষমা তিনি পেয়েছিলেনও বটে।

আমরা আয়াতটিকে কীভাবে নেব? আমরা কী অতীতের পাপ নিয়ে ভয় পাচ্ছি? আমাদের আমলনামায় কি এমন কোনো সাংঘাতিক পাপ আছে যা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে মুছে নেওয়া জরুরি? যদি উত্তর হয় 'হ্যাঁ' তা হলে নবিদের অনুকরণ করুন, সিদ্দীকদের অনুকরণ করুন। যারা আপনার প্রতি অন্যায় করেছে, তাদেরকে ক্ষমা করে দেবার দ্বারা প্রমাণ করুন, আপনিও ক্ষমা পেতে আগ্রহী।

আল্লাহর পথে ফেরার যাত্রায় আমাদের প্রত্যেকের সম্মুখে শয়তান দেওয়াল তৈরি করবে। পূর্বের রাস্তায় ফিরে যাবার জন্য নানানভাবে ফুসলাবে, আগের জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইবে। আর সেই পথ নির্ঘাত ধ্বংসের পথ।

'(শয়তান) বলেছিল, "তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে, তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।"'[২১৫]

আমরা যখনই ভালো কিছু করতে আগ্রহী হব, তখনই ইবলিশ উপস্থিত হবে। আমাদেরকে বাধা দিতে সে কিন্তু চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবে না। বিশেষ করে আত্মশুদ্ধির পথচলায়। সে এখানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং আপনার সাথে তর্ক জুড়ে দেবে। একজন মুসলিম যখন অপর মুসলিমের সাথে সবকিছু মিটমাট করতে চায়, তখন শয়তান তাকে অনেকটা এ ধরণের যুক্ত দিয়ে আটকায় :

সে বলে, 'তুমি যদি রাগ দমন করে ফেলো, প্রতিশোধ না নাও, তা হলে তোমার অন্তর বিষে ভরে যাবে এবং এই বিষ তোমার জন্য ক্ষতিকর। কাজেই নিজেকে শান্তি দাও!

---

[২১৪] সূরা আন-নূর, ২৪ : ২২
[২১৫] সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৭

একটু হলেও রাগকে প্রকাশ পেতে দাও!'

এর জবাব কী হবে? আমরা তা-ই বলব যা আমাদের রাসূল ﷺ শিখিয়েছেন :

وما مِن جرعةٍ أحبَّ إلى اللهِ من جَرعةِ غَيظٍ يكظِمُها عبدٌ ما كظَمها عبدٌ للهِ إلّا ملأ جوفَه إيمانًا

'সকল ধরণের গিলে ফেলার ভেতর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো যখন বান্দা আল্লাহর জন্য স্বীয় ক্রোধ গিলে ফেলে (অর্থাৎ রাগ দমন করে)। আর যে এই কাজ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমান দ্বারা তাকে পূর্ণ করে দেবেন।'[১১৬]

লক্ষ করুন, শয়তান বলছে 'রাগ দমন তোমার ভেতরটা বিষে পরিপূর্ণ করে দেবে।' আল্লাহ বলছেন, 'রাগ দমন তোমার ভেতরটা ঈমানে পরিপূর্ণ করে দেবে।'

তবে শয়তান এখানেই হাল ছাড়বে না। সে আরও বলবে, 'দেখো, তোমার তো বহু নেক আমল আছে। তুমি তাহাজ্জুদ পড়ো, কুরআন পড়ো, ইলম অন্বেষণের আসরে বসো। অতএব নিশ্চিত থাকো—আল্লাহ তোমার এই পদস্খলন ক্ষমা করে দেবেন।'

এর জবাবও আমরা রাসূল ﷺ-এর হাদীস দিয়ে দেব :

وَمَا مِنْ جَرْعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا عَبْدٌ، مَا كَظَمَهَا عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا مَلَأَ اللهُ جَوْفَهُ إِيمَانًا

'প্রত্যেক ব্যক্তির আমল সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আল্লাহর সামনে পেশ করা হয়। অতঃপর আল্লাহর সাথে শিরক করেনি এমন সব ব্যক্তিকে তিনি মাফ করে দেন। তবে সেই ব্যক্তিকে নয়, যার সাথে তার মুসলিম ভাইয়ের বিদ্বেষ রয়েছে। বলা হয়, 'এই দুজনকে মাফ করা হবে না যতক্ষণ না তারা মিটমাট করে নিচ্ছে।'[১১৭]

কারও হয়তো অঢেল নেক আমল আছে, তথাপি একটি পদস্খলনের দরুন তারা ক্ষমা পাবে না। আর তা হলো রাগ ধরে রাখা, মুসলিম ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ রাখা।

এদিকে শয়তান ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সে বলবে, 'এখনই ফিরিয়ে নিয়ো না। ঠিকাছে বন্ধু বানিয়ো, কিন্তু এখন না। বছরখানেক পর করো,'

[১১৬] মুসনাদ আহমাদ, ৬১১৪
[১১৭] মুসলিম, ১৫৯৩

এর উত্তরে কী বলব? রাসূল ﷺ-এর হাদীস শুনিয়ে দেব :

مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ

'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে এক বছর যাবৎ সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে, সে যেন তার রক্ত ঝরাল।'[২১৮]

এবার শয়তান বলবে, 'ঠিকাছে, এক বছর লাগবে না। এক সপ্তাহ সময় নাও। এরপর মিটামাট করে নিও। তোমাদের উভয়ের মন-মেজাজ ঠান্ডা হওয়াটা জরুরি।'

এর উত্তরে কী বলব? রাসূল ﷺ-এর হাদীস দিয়েই দেব :

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ، دَخَلَ النَّارَ

'এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের সাথে তিনদিনের বেশি সময় সম্পর্কচ্ছেদ থাকা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি তিনদিনের বেশি থাকবে এবং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে যাবে।'[২১৯]

শয়তান যদি আবার বলে, 'আচ্ছা বাবা আচ্ছা, ঘৃণা করতে হবে না, এক সপ্তাহ অপেক্ষাও করা লাগবে না। বরং তার মধ্যে অপরাধ-বোধটুকু জাগ্রত হওয়ার জন্য অন্তত একটু সবর করো! তাকে আগে ক্ষমা চাইতে দাও!' এবারও নবিজির হাদীস শুনিয়ে দেব :

وخَيْرُهُما الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ

'মনোমালিন্য হওয়া দুজনের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে আগে সালাম দেয়।'[২২০]

'আহা! সে যে তোমার ক্ষমা মঞ্জুর করবে, এর নিশ্চয়তা কী?!' শয়তান বলবে, 'দেখা যাবে তোমার পুরো চেষ্টাটাই ভেস্তে যাবে।'

রাসূল ﷺ বলেন :

لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوقَ ثَلاَثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ، فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِى الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ».

[২১৮] আবূ দাউদ, ৪৯১৫; সহীহ
[২১৯] আবূ দাউদ, ৪৯১৪; সহীহ
[২২০] বুখারি, ৬৩০৯

'এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের সাথে তিনদিনের বেশি সময় সম্পর্কচ্ছেদ থাকা বৈধ নয়। তিনদিন অতিক্রম হয়ে গেলে সে যেন তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং সালাম দেয়। এরপর সে যদি সালামের জবাব দেয়, তা হলে দুজনই পুরস্কৃত হবে। আর যদি জবাব না দেয়, তা হলে সে নিজেই গুনাহগার হবে। অপরদিকে প্রথমজন দোষমুক্ত হয়ে যাবে।'[২২১]

এবার শয়তান সর্বশেষ চেষ্টাটুকু করবে। কেননা সে এটাই চায়, আমাদের অন্তর যেন পরিবর্তন হয়ে যায়। সে বলবে, 'তোমার বিনয় যদি প্রত্যাখ্যান করা হয়, তা হলে তোমার সম্মান ধূলিসাৎ হবে। মান-সম্মান বলে আর কিছুই থাকবে না।'

এবার তাকে রাসূল ﷺ-এর এই হাদীসটি শুনিয়ে দিন, যেখানে তিনি কসম করে জানিয়েছেন শয়তানের এই কথা ডাহা মিথ্যে :

ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ: مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًا، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ

'তিনটি বিষয়ে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি: (১) দান-সদাকা করলে সম্পদ কমে না। (২) বান্দা যখন ক্ষমা চায়, আল্লাহ অবশ্যই তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। (৩) আর যে আল্লাহর জন্য বিনয়বনতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে উঁচু করে দেন।'[২২২]

এতকিছু পড়ার পরেও যে ব্যক্তি সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে, তার ব্যাপারে আর কীই-বা বলা যেতে পারে? যে-কোনো-ক্রমেই ফোন ধরবে না—এমন জেদ ধরে থাকে? আসলে এ ব্যক্তি অহংকারী, তার অন্তর মরে গেছে। সে জান্নাত চায় না, জাহান্নামেরও ভয় করে না।

সর্বদা একজন উত্তম মুমিনের পরিচয় দিন। আর শয়তানকে সব সময় লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলে রাখুন। ফোন ধরুন মুসলিম ভাইয়ের, তার কাছে ক্ষমা চান এবং আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়াবার আগেই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আমলনামা থেকে মুছে ফেলুন। এমন ব্যক্তির মতো হবেন না, যাকে সংশোধন করা অনেক কঠিন।

আ'নাশ ﵀ থেকে বর্ণিত, শা'বি ﵀ বলেছেন,

إن كرام الناس أسرعهم مودة ، وأبطؤهم عداوة ، مثل الكوب من الفضة : يبطئ

---

[২২১] আবু দাউদ, ৪৯১২
[২২২] তিরমিযি, ২০২৫

الانكسار، ويسرع الانجبار، وإن لئام الناس أبطؤهم مودة، وأسرعهم عداوة مثل الكوب من الفخار: يسرع الانكسار ويبطئ الانجبار

'সম্মানিত ব্যক্তিগণ ভালোবাসার বন্ধন গড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে দ্রুতগামী, আর শত্রুতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ধীরস্থির। তারা রুপোর পাত্রের মতো। ভাঙা কঠিন কিন্তু মেরামত সহজ। অপরদিকে সবচেয়ে বদ চরিত্রের ব্যক্তিরা ভালোবাসার বন্ধন গড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ধীরস্থির। আর শত্রুতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে তাড়াহুড়ো-প্রবণ। এরা কাচের পাত্রের মতো। ভাঙা সহজ, কিন্তু মেরামত করা বেজায় কঠিন।'[২২৩]

আসুন সব মুছে দিই, নিজের ভুলগুলো স্বীকার করে সব মেনে নিই, আর শত্রুতা যতটা কম সম্ভব রেখে জান্নাত-পানে এগিয়ে চলি।

পরিশেষে সেই ভাই-বোনদের উদ্দেশে একটি বার্তা পৌঁছে দিতে চাই—যারা আল্লাহর জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছেন, দাওয়াতি কাজ করছেন, বিভিন্ন পরিকল্পনা করছেন এবং সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করছেন। আপনারা ক্ষমা চাইবার এই চারিত্রিক গুণ আরও দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরুন। কেননা আল্লাহর পথে-চলা মানুষগুলো বাতিলের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, পদে পদে নিন্দিত হতে পারে। কখনও-বা মুসলিমরাই তাদের নির্যাতন করবে, অভিযুক্ত করবে, উগ্রপন্থী তকমা জুড়ে দেবে। আর তাই ক্ষমা করার এই গুণ অর্জন ছাড়া আপনি এই পথে টিকে থাকতে পারবেন না। এটি প্রত্যেক নবি-রাসূলের ব্যক্তিত্বের অংশ ছিল। আর তাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন আমাদের রাসূল ﷺ। তাওরাতে তাঁর ব্যাপারে এভাবে বলা হয়েছে :

'আতা ইবনু ইয়াসার ﷺ বলেন, 'আমি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়েছি এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, 'আমাকে বলুন, তাওরাত-গ্রন্থে রাসূল ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ আল্লাহর কসম, তাওরাতে তাঁর ব্যাপারে কুরআন বর্ণিত কিছু গুণ এসেছে। যেমন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

'হে নবি, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।'[২২৪]

---

[২২৩] রওদাতুল উকালা, ১৭৪

[২২৪] সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৪৫।

'নিরক্ষরদের একজন। তুমি আমার দাস এবং রাসূল। আমি তোমার নাম রেখেছি মুতাওয়াক্কিল (ভরসাকারী)। তুমি কঠোর নও, তুমি নির্দয়ও নয়। বাজারে তুমি শোরগোল সৃষ্টিকারী নও। খারাপকে খারাপ দ্বারা প্রতিহত করবে না। তুমি মাফ করে দাও এবং ক্ষমা করে দাও। আর আল্লাহ তাআলা তার দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা ব্যতীত তাঁর মৃত্যু দেবেন না; যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্য দেয়, আর যতক্ষণ না অন্ধ চোখ, বধির কান এবং গাফেল অন্তর তার দ্বারা খুলে যায়।'[২২৫]

নিশ্চয়ই ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ দ্বীন, অতি সূক্ষ্ম এবং মানবীয় বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর তাই ক্ষমা করা মানে সব ভুল এড়িয়ে চলতে হবে—বিষয়টা এমনও না। উদাহরণস্বরূপ : যে-পাপ অন্যের অধিকার হরণ করে, কিংবা যিনি অবিরাম নির্যাতন চালায়, এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই উপযুক্ত পন্থায় আসামিকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। তা ছাড়া এই অধ্যায়ে যে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে, তা মূলত মুসলিমদের মধ্যে তুচ্ছ বিরোধগুলো গুটিয়ে নেবার আহ্বান জানিয়ে লেখা। অর্থাৎ তুচ্ছ কিংবা ক্ষুদ্র-থেকে-ক্ষুদ্র যে বিষয়গুলোর কারণে আমরা শত্রুতা করি, 'আল-হিজর' (বৈধ বয়কট) করার শর্তগুলো পূরণ না হলেও। মুসলিম ভাই-বোনদের সাথে আমাদের অধিকাংশ সম্পর্কচ্ছেদের মূলে থাকে এ ধরণের তুচ্ছ বিষয়ই, যা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পর্ক ছেদ করার কোনো বৈধ কারণ নয়। এমনকি যারা দাবি করে, আল্লাহর জন্য সম্পর্কচ্ছেদ করেছে—তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, 'আল-হিজর করার শর্তগুলো কী?' দেখবেন, তারা উত্তর দিতে পারবে না। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, তাদের এই বয়কট বিন্দুমাত্র আল্লাহর জন্য নয়। বরং স্বীয় প্রবৃত্তির খায়েশ মেটানোর জন্য।

সবশেষে আমি আহ্বান করব, আসুন আল্লাহর এই কথাটি আমরা অন্তরে গেঁথে নিই :

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّـهِ

'অতপর যে মাফ করে দেয় এবং সংশোধন করে তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব। আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।'[২২৬]

আর এসব বান্দাদের দলভুক্ত হই :

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

'যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।'[২২৭]

---

[২২৫] বুখারি, ২১২৫

[২২৬] সূরা আশ-শূরা, ৪২ : ৪০

[২২৭] সূরা সূরা আশ-শূরা, ৪২ : ৩৭

এবং আল্লাহর এই উপদেশ মেনে চলি,

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝

'মন্দকে প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারও ভাগ্যে জোটে না। এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।' [২২৮]

[২২৮] সূরা, ৪১ : ৩৪-৩৫

খুশু : সবচেয়ে কঠিন যে ইবাদাত

'খুশু' একজন মুসলিমের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত। সাথে সাথে সবচেয়ে উপেক্ষিত ইবাদাতগুলোর একটি। সন্দেহাতীতভাবে সর্বাধিক কঠিন ইবাদাতও বটে। এজন্য অন্তর এতে স্থির হবার আগ পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় প্রয়োজন।

খুশু—অন্তরের বিনম্রতা, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ অনুগত, তাঁর জন্য বিগলিত হওয়া। খুশু এমন কোনো আমল নয়, যা আপনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে করবেন। কেবল সালাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এটি।

খুশু—অন্তরের এমন এক অবস্থা যা সময়ের পরিক্রমায় আপনাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। অনেকটা জমিনে হেঁটে চলেও মনকে সাত আসমানের রবের সাথে জুড়ে রাখার মতো। তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হওয়া। আপনি বড়োই অসহায়, তাঁকে ছাড়া কিছু করার সামর্থ্য নেই আপনার, তাঁর সাহায্য ছাড়া আপনি নিতান্তই একজন প্যারালাইজড ব্যক্তির মতো—এরকম অনুভূতি মনে জাগ্রত করা।

সত্যি বলতে খুশু এমন এক মুহূর্ত, যখন আপনি সাজদা থেকে মাথা তুলে অনুভব করবেন—মাটি থেকে মাথা তুললেও আপনার অন্তর তুলতে পারেননি, সে সাজদাবনতই রয়ে গেছে মাওলার জমিনে। এ হচ্ছে এমন এক অবস্থা যখন ব্যক্তি কেনা-বেচা, সামাজিকতা ইত্যাদির সাথে জড়িত থেকেও তার অন্তর ডেকে চলে,

'আল্লাহ, আমাকে আমার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েন না। আমি তো আপনারই দয়ার ভিখারি ইয়া রব।

আল্লাহ, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দিন। আপনি সবকিছুই জানেন এবং সব দেখেন, যা কেউ দেখে না।

আল্লাহ গো, আপনি যেমন ইবাদাত পাওয়ার হকদার, আমি তো সেভাবে ইবাদাত করতে

পারিনি ইয়া গফূর!'

আপনি কি এরকম অনুভব করেছেন কখনও? পেয়েছেন এরকম স্বাদ? নাকি আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্কটা এখনও অনুভূতিহীন যন্ত্রের মতোই রয়ে গেছে?

আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّـهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

'ঈমান-গ্রহণকারীদের জন্য এখনও কি সে সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে তাদের মন বিগলিত হবে, তাঁর নাযিলকৃত মহাসত্যের সামনে অবনত হবে?'[২২৯]

সত্যি করে বলুন তো, আপনার অন্তর কি আয়াতটি পড়ে নাড়া দিয়েছে? যদি উত্তর হয়, 'এ আর তেমন কী!', তা হলে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আয়াতটি সাহাবিদের কানে কতটা ভারী ঠেকেছিল আসুন দেখি :

ইবনু মাসঊদ ﷺ বলেন,

مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ

'আমাদের ইসলাম কবুল এবং আল্লাহর এই আয়াত নাযিলের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র চার বছর।'[২৩০]

ইবনু উমর ﷺ যখন আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন, তিনি এতই কাঁদতেন, তাঁর দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ত। আর তিনি বলতেন,

بلى يا رب، بلى يا رب

"অবশ্যই আমার রব, অবশ্যই! (সময় চলে এসেছে)।"[২৩১]

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন,

إن الله استبطأ قلوب المؤمنين

'আল্লাহ মুমিনদের অন্তরকে ধীরগতির দেখতে পেয়েছেন। (তাই এই আয়াত নাযিল করে সতর্ক করেছেন)।'[২৩২]

---

[২২৯] সূরা আল-হাদীদ, ৫৭ : ১৬।

[২৩০] মুসলিম, ৩০২৭

[২৩১] আদ-দুরারিল-মানছুর ফিত-তাফসীর বিল-মা'ছুর, ৮/৫৯

[২৩২] তাফসীর ইবনু কাসীর, ৮/৫২

সাহাবিদের মুখে এমন বাক্য শোনা সত্যিই আশ্চর্যজনক। অথচ কুরআনের ভাষায় তাঁরা ছিলেন "সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিকর, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।"[২০৩] এবং তাঁরা, "আল্লাহর সাথে তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে।"[২০৪] তথাপি আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরকে আরও উঁচু স্তরে নেবার জন্য বলছেন। এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর হক আদায়ে আমাদের অন্তরের খুশু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১) কিন্তু খুশু আসলে কী?

শাব্দিক অর্থে খুশু হলো :

الانخفاض والذل والسكون

'নিচুতা, নম্রতা এবং স্থিরতা'[২০৫]

অর্থ আরও ভালোভাবে বুঝতে আসুন কুরআনের দিকে ফিরে যাই, কুরআনের পাতায় দেখি আল্লাহ তাআলা শব্দটিকে কীভাবে ব্যবহার করেছেন।

তিনি বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

'আর এটিও আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি যে, তোমরা দেখতে পা—ভূমি শুষ্ক শস্যহীন পড়ে আছে। অতপর আমি যেইমাত্র সেখানে পানি বর্ষণ করি হঠাৎ তা অঙ্কুরোদগমে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে।'[২০৬]

'শুষ্ক শস্যহীন' শব্দটি আরবি আয়াতে এসেছে خَاشِعَةً 'খশিআহ' শব্দে, যা খুশু অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

বিচার-দিবসের আলোচনায় আল্লাহ বলেন,

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

---

[২০৩] সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩৭
[২০৪] সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ২৩
[২০৫] ইবনুল কাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ১/৫১৬
[২০৬] সূরা হা-মীম সাজদা, ৪১ : ৩৯

'এবং পরম করুণাময়ের সামনে সকল আওয়াজ নিচু হয়ে যাবে। তাই মৃদু আওয়াজ ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবে না।'[২৩৭]

'নিচু হয়ে যাবে' বোঝাতে আরবি আয়াতে এসেছে خَشَعَت খশাআত। খুশু, খশিআহ, খশাআত শব্দগুলো আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী একই শব্দমূল থেকে নির্গত।

তা হলে খুশুর প্রায়োগিক অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে? আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে কী দেখতে চাচ্ছেন? ইবনু রজব ﷀ বলেন,

هو انكساره لله، وخضوعه، وسكونه عن التفاته إلى غير من هو بين يديه، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه

'খুশু হলো আল্লাহর জন্য চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া, তাঁর জন্য নিচু হওয়া। এবং আল্লাহর সম্মুখে থাকাবস্থায় অন্তর স্থির হওয়া। অতঃপর অন্তর যখন খুশু অর্জন করে, সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তা প্রকাশ পায়।'[২৩৮]

২) খুশু অর্জনকারীদের কিছু নজির

মন-দিয়ে নবিজি ﷺ-এর নিম্নোক্ত দুআটি পড়ুন, দেখুন কী ভাষায় তিনি সাজদাবস্থায় আল্লাহর গুণকীর্তন করতেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَلَكَ أَسْلَمْتُ , خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي

'ও আল্লাহ, শুধু তোমার জন্যই আমি রুকু করেছি, শুধু তোমার ওপরেই ঈমান এনেছি, শুধু তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, শুধু তোমার জন্যই বিনম্র হয়েছে আমার শ্রবণ, আমার দৃষ্টি, আমার মস্তিষ্ক, আমার অস্থি-মজ্জা, আর আমার শিরা-উপশিরা।'[২৩৯]

সাহাবিদের বিরতিহীন খুশুর ব্যাপারে তাবিয়ি হাসান বাসরি ﷀ বলেন,

وكنتُ والله إذا رأيتُهم رأيتُ قوماً كأنهم رأى عين —يعني: للجنة والنار— فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل، ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله، ولا أظهروا ما ليس

[২৩৭] সূরা ত্বহা, ২০ : ১০৮

[২৩৮] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ৬/৩৬৭

[২৩৯] মুসলিম, ১৮৪৮

في قلوبهم

'আল্লাহর কসম, তাদের দিকে তাকালে দেখতাম, তাঁরা এমন এক প্রজন্ম যেন স্বচক্ষে জান্নাত জাহান্নাম দেখতে পাচ্ছে! আল্লাহর কসম, তাঁরা ঝগড়াটে ছিলেন না, ছিলেন না বাতিলপন্থীদের মতো। শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাবেই পরিতৃপ্তি খুঁজে পেতেন। আর তাঁরা এমন কিছু প্রকাশ করতেন না যা তাদের অন্তরে নেই।'[২৪০] অর্থাৎ তাদের মধ্যে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না।

একদিন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﵁ সূরা আল-মুতাফফিফিন তিলাওয়াত করছিলেন। যখন এই আয়াতে এসে পৌঁছোলেন,

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

'যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগৎসমূহের রবের সম্মুখে।'[২৪১]

তিনি অঝোরে কাঁদলেন। কাঁদতে কাঁদতে পড়েই গেলেন, এরপর আর তিলাওয়াত শুরু করতে পারলেন না।[২৪২]

মাসরূক ﵀ বলেন,

قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري صلى ليلة حتى أصبح أو كاد يقرأ آية، يرددها ويبكي: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

'মক্কার এক অধিবাসী আমাকে বলল, 'তোমার ভাই (সাহাবি) তামীম আদ-দারী ﵁-এর স্থান এটি। সকাল হবার আগ পর্যন্ত তিনি রাতভর এখানে সালাত আদায় করতেন অথবা এক আয়াত পড়েই কাটিয়ে দিতেন গোটা রাত। বারবার আয়াতটি পড়তেন এবং কাঁদতেন,

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

'যেসব লোক অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে তারা কি মনে করেছে যে, আমি তাদেরকে

---

[২৪০] মুহাম্মাদ ইবনু নাসর, কিয়ামুল-লাইল, ১/৪২
[২৪১] সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৮৩ : ৬
[২৪২] আহমাদ, আয-যুহদ, ১০৬৯

এবং মু'মিন ও সৎকর্মশীলদেরকে সমপর্যায়ের করে দেব, যেন তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যায়? তারা যে ফয়সালা করে, তা অত্যন্ত জঘন্য!' [সূরা আল-জাসিয়া ৪৫ : ২১][২৪৩]

একবার তাবিয়ি ছাবিত বুনানি ﵀ ডাক্তারের কাছে গেলেন চোখব্যথা নিয়ে। ডাক্তার তাঁর চোখ দেখে বলল,

اضمن لى خصلة تبرأ عينك

'আমাকে ওয়াদা দিন, তা হলে আপনার চোখ ভালো হয়ে যাবে।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কীসের ওয়াদা?' ডাক্তার বলল, 'আপনি কাঁদবেন না।'

এ কথা শুনে ছাবিত ﵀ বলেন,

وَمَا خَيْرٌ فِي عَيْنٍ لَا تَبْكِي؟

'যদি কাঁদতেই না পারলাম, তা হলে এই চোখ থেকে লাভ কী?!'[২৪৪]

৩) খুশু কেন এত দামি?

• আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে প্রশস্ত দরজা খুশু

ইবাদাতের মূল এবং সারনির্যাস খুশু, আল্লাহর সন্তুষ্ট লাভের সবচেয়ে প্রশস্ত এবং দ্রুতগামী পথ। তথাপি এটা বলা মোটেও অতিরঞ্জন হবে না যে, আমাদের অধিকাংশের জীবনে খুশুর অভিজ্ঞতা নেই। জীবনে কখনোই অনুভব করিনি খুশুর স্বাদ।

কত চমৎকারভাবেই-না ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀ এই বাস্তবতা তুলে ধরেছেন, তিনি বলেন,

دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها ، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول

'আল্লাহর কাছে যাবার জন্য ইবাদাতের সবকটি দরজা দিয়ে আমি প্রবেশের চেষ্টা করেছি। প্রতিটি দরজার কাছেই দেখতে পেয়েছি ভিড় লেগে আছে। ফলে ঢুকতে পারিনি...'

[২৪৩] আহমাদ, আয-যুহদ, ১০১৫
[২৪৪] মুহাম্মাদ ইবনু নাসর, কিয়ামুল-লাইল, ১/১৪৬

অর্থাৎ লোকসমাজে প্রচলিত ইবাদাত; যেমন : সালাত, সিয়াম, সদাকা, দাওয়াহ, কুরআন এবং এ-জাতীয় যত আমল আছে, এগুলো দিয়ে আবিদ-শ্রেণীর মানুষদের সাথে প্রতিযোগিতা করা কঠিন, আলহামদু লিল্লাহ।

এরপর তিনি বললেন,

حتى جئت باب الذل والافتقار ، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ، ولا مزاحم فيه ولا معوق ، فما هو إلا أن وضعت قدمى فى عتبته ، فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدى وأدخلنى عليه

'...এভাবে (চলতে চলতে) আমি নীচুতা এবং দরিদ্রের দরজার কাছে পৌঁছোলাম। দেখলাম এটা আল্লাহর কাছে যাবার সবচেয়ে দ্রুতগামী এবং প্রশস্ত দরজা। কিন্তু এর সামনে কোনো ভিড় পেলাম না, কোনো বাধারও সম্মুখীন হলাম না! তারপর আমার পা ভিতরে রাখতেই আল্লাহ আমার হাত ধরে টেনে নিলেন। এরপর তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন।'[২৪৫]

বাহ্যিক ইবাদাতে আমরা অনেকেই অভ্যস্ত। এগুলো আমাদের নিত্যদিনের অংশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ভিতর থেকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হওয়া, বিনম্রতা অনুভব করা, নিজেকে তুচ্ছ জানা—মহান রব এগুলোই চান। ইবনুল কাইয়িম ﷺ এমনটাই বলেছেন। আমাদের অধিকাংশের জীবনে এই অংশটির বড়োই অভাব, অথচ সবকিছু পাল্টে দিতে পারে এটি। জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম।

- **খুশু ছোটো আমলকেও অমূল্য সম্পদ বানায়**

সত্যিই, খুশু এক অলৌকিক হরমনের মতো। যখনই কোনো আমলের সাথে একে জুড়ে দেওয়া হয়, তখনই সেই আমলের পরিণাম এবং মর্যাদা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। খুশুহীন সারা রাত সালাতের চেয়ে খুশু-সম্পন্ন আপনার দুই রাকআত সালাত আল্লাহর নিকট অনেক অনেক প্রিয়। আল্লাহর প্রিয় হবার শর্টকাট পদ্ধতি এটি। ভেবে দেখুন, এই ক্ষুদ্র জীবনে এমন শর্টকাট পথ আসলেই কতটা জরুরি আমার আপনার।

সূরা ইখলাসের তাফসীরে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ বলেন :

"إن هذه السورة مع ما فيها من الثواب والأجر، والمنزلة إلا أن العبد قد يقرأ آية سواها، ويخشع فيها، فيكون ذلك أعظم من قراءته هذه السورة، بل يقول: "إن

[২৪৫] মাদারিজুস সালিকীন, ১/৪২৯

العبد قد يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، مع حضور القلب واتصافه بمعانيها فيكون ذلك أفضل فى حقه من قراءة سورة "قل هو الله أحد" مع الجهل والغفلة"

'যদিও-বা এই সূরা (ইখলাস) পড়লে অনেক সাওয়াব এবং পুরস্কার নসিব হয়, তথাপি বান্দা যদি এই সূরা ছাড়াও অন্য কোনো আয়াত খুশুর সাথে তিলাওয়াত করে, তা হলে তার পুরস্কার এই সূরা পাঠ থেকেও বেশি হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বান্দা যখন মন থেকে, অর্থ বুঝে বুঝে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলে, তখন অজ্ঞতা এবং অন্যমনস্ক অবস্থায় সূরা ইখলাস পাঠ করার চেয়েও বেশি সাওয়াব নসিব হয়।'[২৪৬]

- **শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূরীকরণে খুশু**

শয়তানের ওয়াসওয়াসা কি আপনাকে কাবু করে ফেলেছে? আপনার চালচলন নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে গেছে? যদি তাই হয়, তা হলে খুশুকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিন। কেননা শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং খুশু একসাথে অন্তরে অবস্থান করতে পারে না।

আলিমগণের ভাষায় :

من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان

'যে অন্তরে খুশু আছে, শয়তান তার নিকটবর্তী হতে পারে না।'[২৪৭]

৪) কীভাবে এমন বিস্ময়কর আমলে অভ্যস্ত হওয়া যায়?

- **মা'রিফাতুল্লাহ বা আল্লাহকে চিনুন**

হয়তো ভাবছেন, 'আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ক ভাটা পড়েছে। আগের মতো আর আগ্রহ পাই না।' এর মানে এ নয়, আপনি খারাপ। আসল কারণটা হয়তো এর থেকেও সাধারণ। হয়তো আপনি এখনও আপনার রবকে চিনতে পারেননি।

[২৪৬] মাজমূ আল-ফাতাওয়া, ১৭/১৪০
[২৪৭] মাদারিজুস সালিকীন, ১/৫১৭

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন,

من عرف الله أحبه ولا بد

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পেরেছে, সে অবশ্যই তাঁকে ভালোবাসবে।'[২৪৮]

সেই মাওলাকে চিনতে, তাঁকে জানতে নেমে পড়ুন। কঠোর মুজাহাদা করুন। তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করুন, তাঁর নাম ও গুণসমূহ নিয়ে পড়াশোনা করুন। ইত্যাদি মাধ্যমে তাঁকে জানার চেষ্টা করুন। এরপর নিজেই দেখুন, আপনার মনের আকাশে হারিয়ে-যাওয়া খুশু-নামক সূর্যটি কীভাবে উদয় হচ্ছে।

- **তাঁকে বেশি বেশি স্মরণ করুন**

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ

'তারা কি কখনও আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করেনি? এবং আল্লাহর সৃষ্ট কোনো জিনিসের দিকে চোখ মেলে তাকায়নি?'[২৪৯]

তিনি আরও বলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا

'(হে নবি,) এদেরকে বলে দাও, "আমি তোমাদেরকে একটিই উপদেশ দিচ্ছি—আল্লাহর জন্য তোমরা একা এবং দুজন মিলে নিজেদের মাথা ঘামাও এবং চিন্তা করো।..."'[২৫০]

সমগ্র দুনিয়া একটি বৃহৎ মাসজিদরূপে তৈরি করা হয়েছে যেন আপনি চিন্তা-ভাবনা করেন। একদিন সাহাবি উম্মু দারদা ﷺ-কে তাঁর স্বামী আবুদ দারদা ﷺ-এর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো, 'তিনি কোন আমল বেশি করতেন?' উম্মু দারদা ﷺ বলেন,

التفكر والإعتبار

'গভীর চিন্তা-ভাবনা।'[২৫১]

---

[২৪৮] তরিকুল হিজরাতাইন, ২৮০
[২৪৯] সূরা আল-আ'রাফ, ৭ : ১৮৫
[২৫০] সূরা সাবা, ৩৪ : ৪৬
[২৫১] তারিখু মাদীনাতি দিমাশক, ৪৭/১৪৯

• খুশু অর্জনে প্রয়োজন নির্মল অন্তর

আমরা জেনে এসেছি খুশু কোনো বাহ্যিক আমলের নাম নয়। এটি অন্তরের আমল। এবং এও বুঝতে পেরেছি, কেন আমাদের অনেকের জন্য এটি বেশ কষ্টসাধ্য। আসলে আমরা খুশুর জন্য অন্তরে কোনো জায়গা রাখিনি। মানব-অন্তরে অনেকগুলো ঘর রয়েছে। এই ঘরগুলোতে অনেক বিষয় একসঙ্গে অবস্থান করে। কিন্তু সেই ঘরগুলো যদি আপনি পাপ, গানবাজনা, অনর্থক বিষয়াদি এবং যৌন-উদ্দীপনায় মাতিয়ে রাখেন, তা হলে কীভাবে সেই অন্তরে খুশু নসিব হবে? বরং কল্যাণ প্রবেশের আগেই তা উচ্ছেদের সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। সত্যি বলতে কী, আমরা প্রত্যেকেই জানি, এই খুশু অর্জনের প্রক্রিয়া কীভাবে শুরু করতে হবে, এবং অন্তর থেকে কোন কোন বিষয়গুলো সর্বপ্রথম বের করে ফেলতে হবে।

• আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চান

যায়দ ইবনু আরকাম ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ-এর একটি দুআ ছিল :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ

‘আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবরের আযাব থেকে।

اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

‘আল্লাহ, তুমি আমার মধ্যে তাকওয়ার অনুভূতি দাও, আমার নফসকে পবিত্র করো, নফস পবিত্রকরণে তুমিই সর্বোত্তম। তুমিই এর অভিভাবক এবং মাওলা।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

‘আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এমন ইলম থেকে যা কোনো উপকারে আসে না, এমন হৃদয় থেকে যা বিনম্র হয় না, এমন আত্মা থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দুআ থেকে যার উত্তর মেলে না।’[২৫২]

সত্যি বলছি, কেবল বাহ্যিক পোশাক-আশাকে নয়, অলঙ্কারপূর্ণ উপদেশ-দানে নয়, এবং হৃদয়গ্রাহী পোস্ট লিখতে পারাই নয়, বরং এই খুশু হলো আপনার এবং আল্লাহর

[২৫২] মুসলিম, ৭০৮১

মধ্যে একটি গোপন সম্পর্ক। আল্লাহ এবং আপনি ছাড়া এই সম্পর্ক কেউই টের পায় না। আর পাহাড়সম খুশুহীন-নিষ্প্রাণ আমলের চেয়ে খুশুযুক্ত সরষের দানা পরিমাণ আমলও আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয়।

যে অন্তরগুলো খুশু অর্জন করতে পেরেছে, সেই অন্তরের অধিকারীরা কতই-না সৌভাগ্যবান! আল্লাহর রহমতের কতই-না নিকটে পৌঁছে গেছে তারা! এদের মুক্তি দ্রুত হবে না তো কাদের?

আল্লাহ,

তুমি আমাদের দয়া করো, যদিও আমরা দয়ার অযোগ্য..

তুমি আমাদের মাফ করো, যদিও আমরা ক্ষমার যোগ্য নই..

আমাদের খুশু দাও, যদিও আমাদের অন্তর পাথরের মতো শক্ত..

আমাদের মুক্তি দাও, যদিও আমরা শাস্তির দিকে দৌড়ে যাই..

ও আল্লাহ!

নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা

আত্মতৃপ্তি

কুরআনে একটি আয়াত আমরা প্রায়ই পড়ি, কিন্তু সে অনুযায়ী খুব একটা মনোযোগ দিই না। সত্যি বলতে কী, আয়াতটি গভীর চিন্তার দাবি রাখে।

"...পা দৃঢ় হওয়ার পর পিছলে যাবে।"[২৫৩]

আল্লাহ বলেননি 'পা দুর্বল হওয়ার পর পিছলে যাবে।' বরং বলছেন 'দৃঢ় হওয়ার পর'।

দুনিয়ার এই জীবন অসংখ্য পরীক্ষার সমষ্টি। পালাবদল করে পরীক্ষা আসতে থাকে। আর আল্লাহ যদি আমাদের অন্তরকে দৃঢ় না রাখতেন, তা হলে আমাদের ভিতরটা কষ্টে, আঘাতে দুমড়ে-মুচড়ে যেত। আমরা নিজেরাই অবাক হয়ে যেতাম! কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই দ্বীনের পথে আমাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দিত এই পরীক্ষাগুলো।

এ ধরনের পদস্খলন যে সব সময় ধীর গতিতে হবে, তাও না। আসলে দ্বীনের ওপর দৃঢ়তা স্রেফ নসিহত শোনা বা পড়ার দ্বারা বজায় থাকে না। বরং তা বজায় থাকে তাৎক্ষণিক আমলে নেবার দ্বারা। এর প্রমাণ আল্লাহর এই বাণী,

"...অথচ তাদেরকে যে নসিহত করা হয় তাকে যদি তারা কার্যকর করত, তা হলে এটি হতো তাদের জন্য কল্যাণকর এবং অধিকতর দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রমাণ।"[২৫৪]

আপনার উপদেশ কেউ না বুঝতে পারলে, তাকে তুচ্ছজ্ঞান করবেন না। তদ্রূপ অবিরাম পাপ করে চলছে, এমন কারও ওপর আশাও ছেড়ে দেবেন না। অবাক হবেন না সেই

---

[২৫৩] সূরা আন নাহল, ১৬ : ৯৪
[২৫৪] সূরা আন-নিসা, ৪ : ৬৬

বোনকে দেখে, যিনি এখনও ঠিকভাবে হিজাব করছেন না। আর আপনি যে আল্লাহর প্রশংসা করতে পারছেন, দ্বীনের ওপর আছেন, এগুলো আপনার কৃতিত্ব নয়; বরং আল্লাহর করুণারই ফল।

বিশ্বাস হলো না? বেশি কিছু করতে হবে না, শুধু তাদের কাছে যান, যারা হিদায়াত পাওয়ার পর আবার খুইয়ে ফেলেছে, জাহিলিয়াতের জীবনে পুনরায় ফিরে গেছে। তাদের জিজ্ঞেস করুন, বুঝতে পারবেন—তারা ফেঁসে গেছে।

আপনি কি জানেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকেও অনুরূপ বলেছেন?

> "আমি তোমাকে অবিচল না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে।"[২৫৫]

হ্যাঁ, আল্লাহর দয়া না থাকলে নবিজির অন্তরও ভ্রান্তির সম্মুখীন হতো। তা হলে আপনার আমার অবস্থান কোথায়?

দ্বীনের পথে আপনার অবিচলতা, প্রত্যহ নিজেকে আরও এগিয়ে নেবার আগ্রহ-উদ্দীপনা—এগুলো কোনোটাই আপনার হাতের কামাই নয়। এগুলো কেবল আল্লাহরই দয়া।

'তা হলে আমরা কী করব? ফিতনার এই যুগে কীভাবে আমরা দ্বীনের ওপর অবিচল থাকব?'

৫টি নসিহত লিখে রাখুন। এগুলো দ্বারা আপনি দ্বীনের ওপর অবিচল থাকতে পারবেন ইন শা আল্লাহ :

১. কুরআন পড়ুন, কুরআন নিয়ে ভাবুন

> আল্লাহ বলেন, 'আপনার হৃদয়কে তা দ্বারা মজবুত করার জন্য।'[২৫৬]

২. পূর্ববর্তী নেককারদের জীবনী পড়ুন

> 'আর হে মুহাম্মাদ, রাসূলদের যেসব বৃত্তান্ত যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, এসব এমন জিনিস যার মাধ্যমে আমি তোমার হৃদয়কে মজবুত করি।।'[২৫৭]

---

[২৫৫] সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ৭৪

[২৫৬] সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৩২

[২৫৭] সূরা হুদ, ১১ : ১২০

৩. জানা-মাত্রই ইলমের ওপর আমল করুন

"...যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা তা করলে তাদের জন্য নিশ্চয়ই কল্যাণকর হতো এবং চিত্তস্থিরতায় দৃঢ়তর হতো।"[২৫৮]

৪. বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হোন

"আর নিজের অন্তরকে তাদের সংগ লাভে নিশ্চিন্ত করো যারা নিজেদের রবের সন্তুষ্টির সন্ধানে সকাল-ঝাঁঝে তাঁকে ডাকে এবং কখনও তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরাবে না। তুমি কি পার্থিব সৌন্দর্য পছন্দ করো? এমন কোনো লোকের আনুগত্য কোরো না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে কিনা নিজের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করেছে এবং যার কর্মপদ্ধতি কখনও উগ্র, কখনও উদাসীন।"[২৫৯]

৫. এবং সবশেষে দুআয় লেগে থাকুন

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ

"হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন।"[২৬০]

---

[২৫৮] সূরা আন-নিসা, ৪ : ৬৬

[২৫৯] সূরা আল-কাহাফ, ১৮ : ২৮

[২৬০] তিরমিযি, ৩৫৮৭

নিশিরাতে আল্লাহর সাথে

লেখাটা যখন লিখছি, তখন রমাদান মাস চলছে। চারিদিকে রমাদানের বরকতে শান্তি বিরাজমান। বরকতময় এই মাসের জন্য, এই শান্তিময় রাতের জন্যে আমরা অধীর অপেক্ষায় ছিলাম। অপেক্ষার প্রহর যেন শেষ হতে চাচ্ছিল না। আলহামদু লিল্লাহ, আমরা আবারও রমাদানের মতো শ্রেষ্ঠ মাসটি পেলাম।

তবে আজকের এই রাত আমরা নবিদের সাথে কাটাব। আলোচনা করব নবিদের চলার পথ নিয়ে, যে পথে তাঁরা সকলে চলেছেন আপন গতিতে। শুধু তাঁরাই নয়, যুগে যুগে জন্ম নেওয়া প্রত্যেক মুজাদ্দিদের[২৬১] পথ এটি। আজ আমরা শিখব অন্তর নরম করার হাতিয়ার, মৃতপ্রায় ঈমানকে তরতাজা করার উপায় এবং আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক গড়ার কার্যকরী কৌশল।

এমন এক আমল আমরা শিখব, যা মুসলিমরা মনে আনন্দ নিয়ে করে। অন্তরের ভালোবাসা নিয়ে রমাদানের প্রথম রাত থেকেই করা শুরু করে। আবার অনেকেই একে অবহেলা করে তাচ্ছিল্যের সাথে। এমনকি রমাদানের শেষ রাত্রিগুলোতেও অবহেলায় একে বিনষ্ট করে। আমি আপনাকে সে বিষয়টা সম্পর্কে সচেতন করছি। মানবজাতিকে দেওয়া আল্লাহর সেই মহান পুরস্কারের কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি দুনিয়ার জান্নাতের কথা। হ্যাঁ, আমি কিয়ামুল লাইলের কথাই শোনাচ্ছি, যাকে আমরা তাহাজ্জুদ বলে থাকি।

রাসূল ﷺ বলেন,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ

'তোমরা অবশ্যই কিয়ামুল লাইল আদায় করবে। কারণ, তা তোমাদের পূর্ববতী

---

[২৬১] সমাজ সংস্কারক

> নেককার লোকদের অভ্যাস ছিল। তোমাদের রবের নৈকট্য লাভের মাধ্যম এটি। এ ছাড়া পাপ থেকে আত্মরক্ষার পথ এবং দেহের রোগব্যাধি দূরকারী।'[২৬২]

রমাদানের প্রতি রাতে তারাবির সালাতে অংশগ্রহণের দ্বারা আমরা এই আমলটি করে থাকি। কিন্তু কিয়ামুল লাইল যে কতটা গুরুত্ব বহন করে, এটা বোঝার জন্য এই একটি বর্ণনাই যথেষ্ট। এটি কোনো সাধারণ আমল নয়। এটি স্রেফ রুকু-সাজদার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তেমনি শুধু রমাদানের জন্যই নির্দিষ্ট নয় এটি; বরং কিয়ামুল লাইল হলো :

১) 'পূর্ববর্তী নেককার লোকদের অভ্যাস'

পূর্ববর্তী নেককারদের কথা যদি বলতে হয়, তা হলে সবার আগে আসবে আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাম। তিনি ছিলেন নেককারদের ভিতর সর্বোত্তম, সবচেয়ে পবিত্র সৃষ্টি। সূরা মুজাম্মিল হলো নবিজির ওপর নাযিল হওয়া প্রথম দিকের সূরা। আলিমগণের ভাষ্যমতে সূরাটি নবিজির ওপর অবতীর্ণ হওয়া তৃতীয় কিংবা চতুর্থ সূরা। এই সূরায় আল্লাহ তাঁর নবিকে নির্দেশ দিয়েছেন :

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

> 'রাতের বেলা সালাতে দাঁড়াও, তবে কিছু সময় ছাড়া। অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম করো। অথবা তার ওপর কিছু বাড়িয়ে নাও। আর ধীরেসুস্থে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করো।'[২৬৩]

যেহেতু সূরা মুজাম্মিল প্রথম দিকের নাযিলকৃত সূরা, তার মানে নবিজিকে দেওয়া আল্লাহর প্রথম নির্দেশসমূহের একটি ছিল কিয়ামুল লাইল। কিয়ামাত-অবধি-আসা মানুষদের হিদায়াতের লক্ষ্যে যে গুরুদায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হবে, কিয়ামুল লাইল ছিল এর পূর্বপ্রস্তুতি। তবে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা নবিজি ﷺ-এর সালাতের বর্ণনা দেবার সময় বলেছেন :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ

> '(হে নবি) তোমার রব জানেন যে, তুমি কোনো সময় রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কোনো সময় অর্ধাংশ এবং কোনো সময় এক-তৃতীয়াংশ সময়

---

[২৬২] তিরমিযি, ৩৫৪৯; হাসান
[২৬৩] সূরা মুজাম্মিল, ৭৩ : ২-৪

ইবাদাতে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দাও। তোমার সঙ্গী একদল লোকও এ কাজ করে।'[২৬৪]

এই আয়াত নাযিল হয় নুবুওয়তী জীবনের শুরুর দিকে। তখন তিন কী চারটি সূরা নাযিল হয়েছিল মাত্র। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা নবিজিকে বললেন, রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম, কিংবা অর্ধরাত সালাতে দাঁড়িয়ে কাটাতেন! অথচ তাকে দেওয়া হয়েছে এই গুটিকয়েক সূরা। তা হলে রাতের এতটা সময় দাঁড়িয়ে তিনি কী করতেন? তিনি কি একই সূরা পুনরাবৃত্তি করে কাটাতেন? না দুআ-যিকর? উত্তর না জানা থাকলেও এটি আমরা সবাই জানি, নুবুওয়াতের সূচনা থেকে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত নবিজি কিয়ামুল লাইল আদায় করেছেন। সত্যিই কিয়ামুল লাইল ছিল 'তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকদের অভ্যাস।'

আবুয যিনাদ ﷺ বলেন,

كُنْتُ أَخْرُجُ مِنَ السَّحَرِ إِلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَمُرُّ بِبَيْتٍ إِلَّا وَفِيهِ قَارِئٌ، وَعَنْهُ: كُنَّا وَنَحْنُ فِتْيَانٌ نُرِيدُ أَنْ نَخْرُجَ لِحَاجَةٍ فَنَقُولُ: مَوْعِدُكُمْ قِيَامُ الْقُرَّاءِ

'রাতের শেষ প্রহরে আমি মাসজিদে নববির উদ্দেশে বের হলে প্রতিবার সেখানে কুরআন তিলাওয়াতকারীদের শব্দ পেতাম।' তিনি আরও বলেন, 'ছোটোবেলায় যখন কোনো দরকারে সাক্ষাতের প্রয়োজন হতো, আমরা বলতাম : কারীদের কিয়ামের সময় বের হব।'[২৬৫]

তাউস ﷺ বলেন,

مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَنَامُ فِي السَّحَرِ

'আমি রাতের শেষ প্রহরে কাউকে ঘুমোতে দেখিনি।'[২৬৬]

ঘটনাটি 'যে পথ জান্নাতে গিয়ে মিশেছে' পরিচ্ছেদে আমি একবার উল্লেখ করেছি। এখানেও আরেকবার উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি :

একবার এক তলিবুল ইলম ইমাম আহমাদ ﷺ-এর বাড়িতে আসে এবং রাত্রিযাপন করে। রাত্রিকালে ইমাম আহমাদ তার কক্ষে এক বালতি পানি রেখে যান, তাহাজ্জুতের

---

[২৬৪] সূরা মুজাম্মিল, ৭৩ : ২০
[২৬৫] মারুযি, মুখতাসার কিয়ামিল লাইল, ১/৯৮
[২৬৬] আবূ নাঈম, হিলতিয়াতুল আওলিয়া, ৪/৫

সময় সে যেন ওজু করতে পারে এই আশায়। কিন্তু ফজরের সময় ইমাম আহমাদ ﵀ তার কক্ষে গিয়ে দেখেন, বালতির পানি আগের মতোই আছে। এ দেখে তিনি বলেন,

سبحان الله!، رجل يطلب العلم، ولا يكون له ورد بالليل!

'সুবহানাল্লাহ! একজন ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করে, অথচ কিয়ামুল লাইল আদায় করে না!'[২৬৭]

সুবহানাল্লাহ! বিষয়টি সত্যিই আশ্চর্যের। এটা কেবল তলিবুল ইলমের ক্ষেত্রেই নয়, মাসজিদ কমিটির মেম্বার, শিক্ষাখাতে নিযুক্ত ব্যক্তি, দাঈ, কুরআনের শিক্ষার্থী কিংবা আদর্শ সন্তান গঠনে দৃঢ় প্রত্যয়ী মা-বাবা যখন রাতের সালাত আদায় করে না, তখন বড্ড কষ্ট হয়। আমি আরও আশ্চর্য তাদের কথা চিন্তা করে যারা জানে কবরের আযাবের কথা, হাশরের মাঠে পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়িয়ে থাকার কথাও যারা জানে কিন্তু কিয়ামুল লাইল আদায় করে না।

২) কিয়ামুল লাইল : 'তোমাদের রবের নৈকট্য লাভের মাধ্যম।'

আপনি কি জানতে চান, কীভাবে আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায়? আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে সহজ রাস্তা কোনটা? উত্তরটি পেতে রাতের সালাতে দাঁড়িয়ে যান। নিশ্চিত পেয়ে যাবেন। সম্ভবত এজন্যই ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনকারীদের আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তারা যেন এই আমল দ্বারা তাঁর প্রশংসা করে। কারণ, এটা আল্লাহর নিকট খুবই মূল্যবান। আর তাদের পুরস্কার? সত্যি বলতে, বিষয়টি আমাদের কল্পনার বাইরে।

আল্লাহ বলেন,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

'তারা শয্যা ত্যাগ করে, তাদের রবকে ডাকে ভয় ও আশা নিয়ে, এবং তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে।'[২৬৮]

বিনিময়ে তারা কী পাবে? এর পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'অতঃপর কোনো ব্যক্তি জানে না তাদের জন্য চোখ-জুড়ানো কী জিনিস

[২৬৭] মানাকিবু ইমাম আহমাদ, ২৭৩

[২৬৮] সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১৬

লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যা করত তার বিনিময়-স্বরূপ।'[২৬৯]

পুরস্কার কী হবে কেন স্পষ্ট করে বলা হলো না? ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷬ একটি সুন্দর নসিহত দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذى أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس

'গভীরভাবে ভেবে দেখুন, তারা যেমন তাদের রাতের সালাত গোপন রাখত, তেমনি তাদের পুরস্কারও গোপন রাখা হয়েছে, কেউ জানে না।'[২৭০]

তার মানে এই নয় যে, কিয়ামুল লাইলের সবগুলো পুরস্কারই আল্লাহ গোপন রেখেছেন। রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا ، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا ، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ ، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

'জান্নাতে একটি প্রাসাদ রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা যাবে।' তখন জনৈক বেদুইন বলল, হে আল্লাহর রাসূল, এটি কার হবে? তিনি বললেন, এটি হবে তার, যে ভালোকথা বলে, অন্যদের আহার করায়, সিয়াম অব্যাহত রাখে এবং রাতে যখন সব মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে সালাত আদায় করে।'[২৭১]

রাসূল ﷺ আরও বলেন,

ثلاثةٌ يحبُّهم اللهُ ويضحَكُ إليهم ويستبشِرُ بهم [..] والذى له امرأةٌ حسنةٌ وفراشٌ لَيِّنٌ حسَنٌ، فيقوم من الليلِ [فيقول] يذَرُ شهوتَه ويذكُرنى، ولو شاء رقدَ

'তিন শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তাদের দেখে হাসেন এবং খুশি হন।... (তিন শ্রেণীর এক শ্রেণী হলো) সেই ব্যক্তি, যার সুন্দরী স্ত্রী এবং নরম বিছানা আছে, কিন্তু সে রাতে সালাতে দাঁড়ায়। আর তাই আল্লাহ বলেন, "সে তার প্রবৃত্তি চাহিদাকে ত্যাগ করেছে এবং আমাকে স্মরণ করেছে। আর সে যদি

---

[২৬৯] সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১৭
[২৭০] ইবনুল কাইয়িম, হাদিল আরওয়াহ, ২৭৮
[২৭১] তিরমিযি, ২৭১৮

চাইত, ঘুমিয়ে থাকতে পারত।"'[২৭২]

প্রশ্ন আসতে পারে, 'আল্লাহ আমাকে দেখে হাসেন! এর অর্থ কী?'

রাসূল ﷺ বলেন,

وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه

'আর তোমার রব যখন কোনো বান্দাকে দুনিয়াতে দেখে হাসেন, (কিয়ামাতের দিন) তার কোনো হিসাব-নিকাশ নেই।' (অর্থাৎ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে)[২৭৩]

৩) কিয়ামুল লাইল : 'পাপের কাফফারা, পাপ থেকে আত্মরক্ষার পথ।'

কী হতে কী হয়ে গেল বুঝে উঠতে পারেননি। এখন কৃত-পাপ কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে আপনাকে। রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। কোনো কাজে শান্তি পাচ্ছেন না। কবরের আযাব, আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর ভয় আপনার মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। ইউটিউব ঘাটছেন, ফেসবুকের বিভিন্ন পেইজ ঘুড়ছেন, তবুও মনকে শান্ত করতে পারছেন না। দংশন করেই চলেছে।

যদি এমন কিছু হয়ে থাকে তা হলে উঠে পড়ুন। কিয়ামুল লাইলকে আঁকড়ে ধরুন, এটাই আপনার চিকিৎসা। কিয়ামুল লাইল পাপের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেয়, আল্লাহর নূর দ্বারা অন্তর পরিপূর্ণ করে দেয়। শুধু তাই নয়, তাওবার পর সেই পাপগুলো পুনরায় সংগঠিত হওয়া ঠেকাতে কিয়ামুল লাইল ঢালের মতো কাজ করে।

কিয়ামুল লাইলের সবচেয়ে বিস্ময়কর বাস্তবতা এটাই—এই সালাত শুধু অতীতের পাপই মিটে দেয় না, সাথে আগামীর সম্ভাব্য পাপ অনুপ্রবেশের ছিদ্রগুলোও বন্ধ করে দেয়। ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এজন্যই হয়তো নবিজি ﷺ কিয়ামুল লাইলকে বলেছেন, 'মুমিনের সম্মান'।

পাপ লাঞ্ছনা বয়ে আনে। পাপে জড়িয়ে যাবার পর অন্তরে অপরাধবোধ কাজ করে, নিজের প্রতি ঘৃণা জাগ্রত হয়। আর এ থেকে নিষ্কৃতির পথ কিয়ামুল লাইল। পাপের শৃঙ্খল ভেঙে কিয়ামুল লাইল এনে দেয় স্বাধীনতা, মৃত অন্তরকে করে জাগ্রত, বিইজনিল্লাহ।

---

[২৭২] মুসতাদরাক হাকীম, ৬৮; সহীহ
[২৭৩] সহীহ আত-তারগীব, ১৩৭১

রাসূল ﷺ বলেন,

أتاني جبريل فقال : يا محمد ، عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك مجزى به ، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس

'আমার কাছে জিবরীল এসে বলল, "মুহাম্মাদ, যতদিন ইচ্ছা বাঁচো, (তবে জেনে রেখো) মৃত্যু তোমার কাছেও আসবে। যাকে ইচ্ছা ভালোবাসো, একদিন তার সাথে বিচ্ছেদ ঘটবে। যা ইচ্ছা আমল করো, এর প্রতিদান তুমি পাবে। জেনে রাখো, কিয়ামুল লাইল মুমিনের সম্মান। আর ইজ্জত হলো মানুষের থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া।"'[২৭৪]

দেখবেন, সাধারণত যারা সালাত ছেড়ে দেয়, তারাই পাপের জগতে হাবুডুবু খাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

'তারপর এদের পর এমন অপদার্থ লোকেরা এদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা সালাত নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করল। শীঘ্রই তারা এই গোমরাহীর (মন্দ)পরিণামের মুখোমুখি হবে।'[২৭৫]

আপনার অতীত কিংবা বর্তমানকে এই মূলনীতির আলোকে যাচাই করুন। আপনি স্পষ্ট দেখতে পাবেন—জীবনের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তগুলোতে সালাতের ব্যাপারে অমনোযোগী ছিলেন।

কিয়ামুল লাইল বা রাতের সালাত হচ্ছে মুমিনের সম্মান। এমন এক সম্মান, যা আল্লাহ তাআলা লোকসমাজে প্রকাশ করে দেন। যদিও-বা সেই মুমিন তা গোপন রাখার চেষ্টা করে।

আতা' খুরাসানি রহ. বলেন,

قيام الليل محياة للبدن ونور فى القلب وضياء فى البصر وقوة فى الجوارح وإن الرجل إذا قام من الليل يتهجد أصبح فرحًا يجد فرحًا فى قلبه

---

[২৭৪] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৪৬৩/৫
[২৭৫] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৯

'কিয়ামুল লাইল হলো শরীরের জন্য জীবন, কলবের জন্য নূর, দৃষ্টির জন্য আলো, আর অঙ্গ-প্রতঙ্গের জন্য শক্তি। ব্যক্তি যখন রাতের সালাত আদায় করে, পরের দিন এমন আনন্দ নিয়ে জাগ্রত হয়, যা সে অন্তর থেকে অনুভব করতে পারে।'[২৭৬]

তাবিয়ি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ﷺ বলেন,

إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم فيراه من لم يره قط فيقول: إني لأحبُ هذا الرجل

'যে ব্যক্তি কিয়ামুল লাইল আদায় করে, আল্লাহ তার চেহারায় নূর উদ্ভাসিত করে দেন। তাকে মুসলিমরা ভালোবাসে, যদিও-বা তাকে প্রথম দেখে। বলে, "সত্যিই লোকটাকে আমার খুব ভালো লাগে।"'[২৭৭]

ইমাম ওয়াকি' ইবনু জাররাহ ﷺ-কে যারাই দেখেছে, একবাক্যে বলেছে— 'এ তো মানুষ নয়, যেন ফেরেশতা!' আর ওয়াকি' ইবনু জাররাহ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তেমনিভাবে যারা তাবিয়ি মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন ﷺ-কে দেখেছে, তার উজ্জ্বলতায় মানুষ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছে, 'সুবহানাল্লাহ!' কারণ, তিনিও তাহাজ্জুদ আদায় করতেন।

এর চেয়েও অবাক-করার মতো কথা ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেছেন,

وقد كان بعضُ النساء تُكثر صلاة الليل، فقيل لها في ذلك، فقالت: إنها تُحسّن الوجه، وأنا أحب أن يحسنَ وجهي

'কিছু নারীরা অত্যধিক পরিমাণে রাতের সালাত আদায় করত। তাদেরকে এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তারা বলে, "কিয়ামুল লাইল চেহারার মাধুর্য বৃদ্ধি করে। তাই আমি পছন্দ করি, এই সালাত দ্বারা আমার চেহারার রূপ লাবণ্য বেড়ে যাক।"'[২৭৮]

আমি নিশ্চিত, ওপরের বর্ণনাটি পড়ে অনেকে হয়তো আজ রাত থেকেই তাহাজ্জুদ শুরু করে দেবেন। হ্যাঁ, এগুলো প্রতিদান। তবে এর চূড়ান্ত প্রতিদান কিয়ামাতের দিনেই প্রকাশ পাবে।

---

[২৭৬] ইবনু আবিদ দুনইয়া, আত-তাহাজ্জুদ ওয়া কিয়ামুল লাইল, ১৭
[২৭৭] আবদুল হক, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, ১০৫৪
[২৭৮] রওদাতুল মুহিব্বীন, ২২১

এর আগে আসুন, আজকের রাতের প্রস্তুতি নিয়ে কিছু কথা বলি :

কিয়ামুল লাইলে কী পরিমাণ আয়াত আমার পড়া উচিত?

রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ

'যে ব্যক্তি রাতের সালাতে দশটি আয়াত পড়বে, তার (নাম) গাফেলদের তালিকায় উঠবে না। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে এক শ আয়াত পড়বে, তার (নাম) অনুগতদের তালিকায় উঠবে। আর যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে এক হাজার আয়াত পড়বে, তার নাম উঠবে মুকান্তিরীন ('কিন্তার' সংগ্রহকারীদের) তালিকায়।'[২৭৯]

কিন্তার শব্দের অর্থ :

مقدار كبير من الذهب ، وأكثر أهل اللغة على أنه أربعة آلاف دينار [..] وقيل : هو جُمْلة كثيرة مجهولة من المال

"প্রচুর স্বর্ণ। অধিকাংশ ভাষাবিদদের মতে চার হাজার দিনারের সমান। [...] অন্যদের মতে অসীম ধন-সম্পদকে কিন্তার বলা হয়।'[২৮০]

তথাপি কিন্তার দ্বারা আসলে নবিজি কী বুঝিয়েছেন, এর ব্যাখ্যা আরেক হাদীসে পাওয়া যায়। তিনি ﷺ বলেন,

والقنطار خير من الدنيا وما فيها

'এক কিন্তার দুনিয়া এবং এতে যা কিছু আছে—এসব থেকে উত্তম।'[২৮১]

এদিকে সহীহ বুখারির বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম ইবনু হাজার رحمه الله একটি চমৎকার তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন,

من سورة (تبارك) إلى آخر القرآن ألف آية اهـ .

---

[২৭৯] আবূ দাউদ, ১৩৯৮; সহীহ

[২৮০] ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া ফি গারীবিল-হাদীস, ৪/১১৩

[২৮১] সহীহ আত-তারগীব, ৬৩৮

'সূরা মুলক (৬৭ নং সূরা) থেকে কুরআনের শেষ সূরা পর্যন্ত ১০০০ আয়াত রয়েছে।'[২৮২]

—কিন্তু আমার যদি এই পরিমাণ আয়াত মুখস্থ না থাকে?

আল্লাহ্ বলেন,

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

'..অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়ো...'[২৮৩]

কোনো-এক ভোরে ইবনু উমর ﷺ আবূ গালিব ﷺ-কে বলেন,

يا أبا غالب ألا تقوم فتصلي ولو تقرأ بثلث القرآن

'আবূ গালিব, তুমি কি রাতের সালাতে দাঁড়াবে না? অন্তত এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ো।'

আবূ গালিব উত্তরে বলেন, 'এখন তো প্রায় ভোর হয়ে গেছে, কীভাবে সম্ভব?' ইবনু উমর বলেন,

إن سورة الإخلاص قل هو الله أحد – تعدل ثلث القرآن

'সূরা ইখলাস-ই কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।'[২৮৪]

—এলার্ম দিয়ে রেখেও যদি উঠতে না পারি?

দুশ্চিন্তার কিছু নেই, আল্লাহ আপনাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

'যে ব্যক্তি রাতের সালাত আদায় করার নিয়ত করে বিছানায় যাবে, অতঃপর সকাল পর্যন্ত ঘুম তাকে কাবু করে ফেললেও নিয়ত অনুযায়ী সে পূর্ণ পুরস্কার পাবে। তখন তার ঘুম হবে মহামহিম রবের পক্ষ থেকে তার জন্য সদাকা-

[২৮২] তারগীব, ১/২৪৮
[২৮৩] সূরা মুজাম্মিল, ৭৩ : ২০
[২৮৪] হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১/৩০৪

স্বরূপ।'[২৮৫]

—এরপরেও যদি কিয়ামুল লাইলের মিষ্টতা চেখে দেখতে ব্যর্থ হই?

নিশিরাতে প্রিয় রবের সাথে গোপন আলাপনের যে সুখ, তা কবিদের কলমেও অবর্ণনীয়। এই আলাপের জন্য প্রতিটি প্রহর গুনতে থাকে রাতের আবিদরা। আল্লাহর সাথে গোপন আলাপ এবং তাঁর সামনে দুআয় হারিয়ে যাবার উৎকণ্ঠা তাদেরকে অস্থির করে রাখে সারাবেলা।

ইমাম আবূ সুলাইমান দারানি ﷺ বলেন,

أَهْلُ اللَّيْلِ فِي لَيْلِهِمْ أَلَذُّ مِنْ أَهْلِ اللَّهْوِ فِي لَهْوِهِمْ ، وَلَوْلَا اللَّيْلُ مَا أَحْبَبْتُ الْبَقَاءَ

'রাতের আবিদরা যে মিষ্টতা রাতে অনুভব করে, তা খেলতামাশায় রত ব্যক্তিদের চেয়েও মিষ্টি। আর রাত বলে যদি কিছু না থাকত, তা হলে আমার বেঁচে থাকাই বৃথা হয়ে যেত।'[২৮৬]

আসলে কিয়ামুল লাইলের গুরুত্ব, ব্যাখ্যা, মধুরতা—কোনোটাই ভাষায় প্রকাশ করার মতো না, যতক্ষণ না ব্যক্তি নিজে চেখে দেখছে।

ইমাম ইবনু রজব ﷺ বলেছেন,

من لم يشاركهم فى هواهم ويذوق حلاوة نجواهم لم يدر ما الذى أبكاهم من لم يشاهد جمال يوسف لم يدر ما الذى آلم قلب يعقوب

'যারা মুনাজাতের স্বাদ পাওয়া ব্যক্তিদের কাতারে নিজেদের শামিল করেনি, তাদের গোপন মুনাজাতের মিষ্টতা দেখেনি, তারা কখনোই বুঝবে না, কোন জিনিসের কারণে মুনাজাতকারীরা কাঁদে। যে ব্যক্তি ইউসুফের সৌন্দর্য দেখেনি, ইয়াকূবের অন্তরের যন্ত্রণা সে কী করে বুঝবে।'[২৮৭]

'কিন্তু আমি তাহাজ্জুদের স্বাদ পাই না কেন?' আপনার মনে হয়তো এই প্রশ্নটি কাজ করছে। আসলে এই রূহানি স্বাদ উপভোগ করতে সময় প্রয়োজন, প্রয়োজন লেগে থাকা। নফস প্রথম প্রথম অনুযোগ করবে, ঘ্যানঘ্যান করবে, বিশ্রামকে প্রাধান্য দেবে, ঘুমানোর বায়না ধরবে, বলবে সময় নেই। অতঃপর যখন নফস অনুধাবন করতে পারবে,

---

[২৮৫] নাসাঈ, ১৭৮৭

[২৮৬] আদ-দীনূরি, আল-মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল-ইলম, ১/৪৭৩

[২৮৭] লাতাইফুল মাআরিফ, ৪৫

আপনি আল্লাহকে পেতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন, পরকালের আবাস নির্মাণে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে আছেন, তখন সে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। না করে যে উপায় নেই তার।

তাবিয়ি ইমাম ছাবিত বুনানি ﵀ বলেন,

كَابَدْتُ الصَّلَاةَ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَتَنَعَّمْتُ بِهَا عِشْرِينَ سَنَةً

'বিশ বছর যাবৎ আমি কিয়ামুল লাইলে সময় ব্যয় করেছি। বিশতম বছরে এসে এর স্বাদ অনুভব করতে পেরেছি।'[২৮৮]

সবশেষে সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা নিজেদের কবরগুলো আলোকিত করে এতে নামার পূর্বেই, তাদের রবকে সন্তুষ্ট করে রবের সাথে সাক্ষাতের পূর্বেই, এবং যারা সালাত আদায় করে তাদের ওপর জানাযার সালাত অনুষ্ঠিত হবার আগেই।

[২৮৮] হিলইয়াতুল আওলিয়া, ২/৩২০

মুমিনের জীবনে অবসর

সূরাটি কুরআনের ছোটো সূরাগুলোর একটি। এতই ছোটো যে তাড়াহুড়োর মুহূর্তে কিংবা যখন দ্রুত সালাত শেষ করার তাগিদ থাকে, তখন অনেকে এই সূরা বেছে নেয়। তবে ছোটো হলেও এতে এমন অমূল্য গুপ্তধন আছে, যা শুধু আমাদের দুনিয়ার জীবনকেই নয়, বরং আখিরাতের জীবনও পাল্টে দিতে সক্ষম। সূরা আশ-শারহ্-এর কথা বলছি। কুরআনের ৯৪ তম সূরা এটি। হাতের নাগালে কুরআনের কপি থাকলে এর আয়াতগুলোতে একটু নজর বুলিয়ে দেখুন। বিশেষ করে এই আয়াতটি :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

'অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনি ইবাদাতে রত হও।'[২৮৯]

এই আয়াত নাযিলের পেছনে একটি গল্প আছে। গল্পটি না জানা ব্যতীত এর আসল মর্ম উদ্ধার করা যাবে না। খেয়াল করে দেখুন, বাক্যটি শুরু হয়েছে 'ফা' অব্যয় দিয়ে। ব্যাকরণের ভাষায় বলে فاء التفريع অর্থাৎ 'শাখা বিন্যাসকরণ ফা'। মানে, এই 'ফা' আসে পূর্বের কোনোকিছুকে বিন্যস্ত করতে। অতএব সবার আগে আমাদের প্রেক্ষাপট জানা জরুরি।

সূরা আশ-শারহ্ যখন নাযিল হয়, খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন নবিজি ﷺ। তিনি তখন মক্কায়। নির্যাতন নিপীড়ন, প্রিয়জনদের হারানো বেদনা—সব মিলিয়ে তাঁর অন্তরে কালোমেঘ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দুঃখে তিনি কাতর। তখন আট-আয়াত-বিশিষ্ট অসাধারণ এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ্ নবিজিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর অসীম দয়ার কথা। বাতলে দিলেন অন্তরের ব্যথা নিরাময়ে করণীয় দিক-নির্দেশনা। ছড়িয়ে দিলেন ভারাক্রান্ত মনে আনন্দের দীপ্তি এবং প্রশান্তির পরশ।

১) আমি কি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিইনি?

২) এবং তোমার বোঝা নামিয়ে দিইনি?

---

[২৮৯] সূরা আশ-শারহ্, ৯৪ : ৭

৩) যে বোঝা ভেঙে দিচ্ছিল তোমার পিঠকে?

এই সূরায় রাসূল ﷺ-কে প্রদত্ত তিনটি নিয়ামাত আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : ১) তার বক্ষ প্রশস্ত করে দেওয়া; ২) তার বোঝা নামিয়ে দেওয়া; এবং ৩) তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেওয়া।

সামনে এগোবার পূর্বে একটি মূলনীতি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে :

আলিমগণ বলেন,

ما أعطاه الله -عز وجل- لنبيه -صلى الله عليه وسلم- فلأتباعه منه نصيب بقدر اتباعهم له

'মহামহিম আল্লাহ তাঁর নবি ﷺ-কে যা দিয়েছেন, তার অনুসারীগণও এর অংশ পাবে। আর তা হবে, কে কত ভালোভাবে তাঁকে অনুসরণ করেছে তার ভিত্তিতে।'[২৯০]

কাজেই বক্ষ প্রশস্ত হওয়া, পাপের বোঝা নামিয়ে দেওয়া, এবং সম্মান বৃদ্ধি পাওয়া—নিয়ামাতগুলো প্রত্যেক মুসলিমই অর্জনে সক্ষম। তবে এটা নির্ভর করছে নবিজির সুন্নাহকে আমরা কতটা আপন করে নিতে পারলাম, তার ওপর।

অতএব তারাই সর্বাধিক সুখী, পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত এবং সম্মানিত, যারা সুন্নাতের পাবন্দিতে অগ্রগামী; যারা এগিয়ে থাকে ইলম, আমল, দাওয়াহ—সব ময়দানে।

তো এই সূরা তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নবির প্রতি মহান আল্লাহর তিনটি করুণা প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় অংশে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে : দুঃখের সাথেই সুখ রয়েছে। সবশেষে তৃতীয় অংশে নবিজিকে একটি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। যে দয়াময় আল্লাহ আপনার প্রতি এই করুণা করলেন, তাঁর শোকর আদায় করুন। আল্লাহ বলেন, 'কাজেই যখন তুমি অবসর পাবে, তখনই (আল্লাহর ইবাদাতে) সচেষ্ট হবে। আর তোমার রবের প্রতি গভীর মনযোগী হবে।'

এখানে কোন কাজ থেকে অবসর পাবার কথা বলা হচ্ছে?

ইবনু মাসউদ رضي الله عنه বলেন, এর মানে হলো : যখন তুমি ফরজ ইবাদাত সমাপ্ত করবে, তখন নিজেকে রাতের সালাতে নিমগ্ন করবে।[২৯১]

কেউ বলেছে : 'সালাত শেষে দুআয় মনোনিবেশ করো।' যেমন : তাশাহহুদ এবং দরুদ

[২৯০] ইবনুল কাইয়িম এবং ইমাম শাতিবি
[২৯১] যাদুল-মাসির ফি ইলমিত-তাফসীর, ৪/৪৬২

শেষে সালাম ফেরানোর আগে দুআ, যাকে আমরা দুআ মাসুরা বলি। ইবনু আব্বাস, দাহহাক, মুকাতিল ﷺ-সহ আরও অনেকেই এই মত ব্যক্ত করেছেন।[২৯২]

হাসান এবং কাতাদা ﷺ বলেছেন, 'এর অর্থ হলো, শত্রুদের সাথে যুদ্ধ শেষ হলে ইবাদাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ো।[২৯৩]

আবার কেউ বলেছে, 'তোমার দুনিয়াবি কাজ শেষে আল্লাহর কাজে নিমগ্ন হও।' মুজাহিদ ﷺ এই মত দিয়েছেন,[২৯৪] এ ছাড়া ইবনু কাসীর [২৯৫] ﷺ এবং ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-ও মতটি পছন্দ করেছেন[২৯৬]

সবগুলো মতই মোটের ওপর কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করছে। একটি আরেকটির সাথে সাঙ্ঘর্ষিক নয়। ইবনু জারীর তাবারি ﷺ বলেছেন, সবগুলো অর্থই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

এ থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হলো, মুমিন-মাত্রই সর্বদা ব্যস্ত। একটুও বেহুদা নষ্ট করার সুযোগ নেই তার। প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকে সে, হয় দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণে, নয়তো আখিরাতের পুঁজি সংগ্রহে। এই মূলনীতি মেনে চললে 'অবসর সময়'-কেন্দ্রিক নানান সমস্যার জোট খুলে যাবে নিমিষেই।

বর্ণিত আছে, ইবনু আব্বাস ﷺ একদিন দুই ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোক দুটো কুস্তি লড়ছিল। তাদের দেখে তিনি বলেন,

مَا بِهَذَا أُمِرْنَا بَعْدَ فَرَاغِنَا

'অবসর সময়ে আমাদের এসব করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।'[২৯৭]

অপরদিকে উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন,

إِنِّي لَأَكْرَهُ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَكُونَ خَالِيًا سَبَهْلَلًا، لَا فِي عَمَلِ دُنْيَا وَلَا دِينٍ

'তোমাদের মধ্যে আমি এমন ব্যক্তিকে অপছন্দ করি, অবসর সময়ে যে দুনিয়ার জন্য কিছু করে না, দ্বীনের জন্যও কিছু করে না।'[২৯৮]

---

[২৯২] প্রাগুক্ত
[২৯৩] তাফসীর আল-কুরতুবি, ২০/১০৯
[২৯৪] তাফসীর আত-তাবারি, ২৪/৪৯৯
[২৯৫] তাফসীর ইবনু কাসীর, ৮/৪১৮
[২৯৬] মাজমূ' আল-ফাতাওয়া, ২২/৪৯৫
[২৯৭] তাফসীর আদওয়া'উল-বায়ান, ৮/৫৭৯
[২৯৮] প্রাগুক্ত

ঠিক এই কারণেই প্রথম দিকের অর্থাৎ সোনালি যুগের মুসলিমদের মধ্যে অবসর সময় নিয়ে কোনো অভিযোগ ছিল না। তারা কখনোই ছুটির আবেদন করেনি, নেক আমল এবং আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়া থেকে অবসর গ্রহণ করেনি।

আসলে যৌবনকালে কিংবা ব্যাচেলর থাকাবস্থায় মানুষ আমল ইবাদাত, দাওয়াহ, ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা, বিভিন্ন পরিকল্পনা করা ইত্যাদি কাজের প্রতি অনেক সক্রিয় ভূমিকা রাখবে—এগুলো স্বাভাবিক। এতে আলাদা কোনো কৃতিত্ব নেই। কিন্তু যখন কর্মজীবনে পা রাখে, বিয়ে করে কিংবা বার্ধক্যে উপনিত হয়, তাদের কর্মোদ্যমেও ভাটা পড়তে শুরু করে। এ-সকল ব্যস্ততার অজুহাতে কি নেক আমল থেকে নিস্তার মিলতে পারে?

'অতএব যখন তুমি অবসর পাবে, তখনই (আল্লাহর ইবাদাতে) সচেষ্ট হবে।'

জব-সেক্টর নিয়ে চিন্তা করুন, কর্মজীবনে মানুষ কতটা কর্মমুখর থাকে? একজন ডেন্টিস্টের কথাই ধরা যাক, তিনি রোগীর-পর-রোগী দেখেই চলেন। দিনে আট ঘণ্টা, কখনও-বা নয় ঘণ্টা ডিউটি। এভাবে সে বছরের-পর-বছর কাটিয়ে দেয়। তাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, 'এই জীবনে আপনি কতজন রোগী দেখার নিয়ত করেছেন? কয়টা দাঁত দেখবেন?' সে আপনাকে কোনো উত্তর দিতে পারবে না, কেননা তার চিন্তাজগতে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই। কেউই এভাবে নির্ধারণ করে রাখে না।

কিংবা একজন রাজমিস্ত্রির কথা ধরুন, বছরকে-বছর সেও নানান প্রজেক্টে কাজ করে চলে। তাকে জিজ্ঞেস করুন, 'এই জীবনে আপনি আর কয়টা ইট বসাবেন?' সে আপনাকে উত্তর দিতে পারবে না, কেননা সে এক প্রজেক্ট শেষ হলে আরেক প্রজেক্ট—এভাবে কাজ করেই যাবে, নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই। তার কাজ করা দিয়ে কথা।

একজন পাইলটের কর্মজীবন নিয়ে চিন্তা করুন, তার জীবনটা হয় ভ্রমণের। আমাদের মধ্য থেকে গড়ে খুব কম মানুষই সপ্তাহে এত দীর্ঘ পথ যাত্রা করে যা তাকে প্রতিদিন করতে হয়। তার গোটা জীবনই এমন অবসাদপূর্ণ ভ্রমণে নিবেদিত। কেননা এর সাথে রুজি সম্পৃক্ত। তাই কষ্ট হলেও করতে হয়। এখন তাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, 'আর কত মাইল আপনি ভ্রমণ করবেন?' সেও কিন্তু আপনাকে উত্তর দিতে পারবে না। তার মস্তিষ্কে এমন নির্দিষ্ট কোনো মাইল নেই।

সবশেষে আমি আপনাকে প্রশ্ন করব : ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ায়, ৬০ কি ৭০ বছর আমরা বাঁচব; এই ক্ষুদ্র সময়জুড়ে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, ভালো থাকার তাগিদে এই যদি আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের নমুনা হয়, তা হলে সেই জীবনের জন্য কতটুকু পরিশ্রম করা প্রয়োজন, যে জীবনে মৃত্যু বলে কিছু নেই?

যে ছুটির অজুহাত দিয়ে নেক আমল থেকে দূরে থাকে, কিংবা দাওয়াহ প্রদান থেকে

অবসরের প্রহর গুনছে, সে আসলে জান্নাতের রাস্তা চিনতে ভুল করেছে; অথবা আমাদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে।

দীর্ঘদিনের দুআ, আত্মত্যাগ, অশ্রু বিসর্জন, নির্ঘুম রাত এবং ভয়-শঙ্কা শেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দাওয়াহ যখন সমগ্র আরব উপদ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল, তখন মানুষ দলে দলে মানুষ ইসলাম কবুল করতে শুরু করল। মক্কা-বিজয়ের সেই আনন্দমুখর দিনে আল্লাহ তাআলা একটি সূরা নাযিল করেছেন। বলুন তো, সেদিন আল্লাহ কী উপদেশ দিয়ে সূরা নাযিল করেছেন? হয়তো ভাবছেন, সূরাটিতে অবসরের বার্তা দেওয়া হয়েছে। না, অবসর-সংক্রান্ত ছিল না। আসুন সূরাটি পড়ি :

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞

'যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যায় এবং বিজয় লাভ হয়। আর (হে নবি,) তুমি যদি দেখো যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করছে, তখন তুমি তোমার রবের হামদ-সহকারে তাঁর তাসবীহ পড়ো এবং তাঁর কাছে মাগফিরাত চাও। অবশ্য তিনি বড়োই তাওবা কবুলকারী।'[২৯৯]

অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলাফল উপভোগের দিন আল্লাহ আআলা তাঁর নবিকে এই আয়াতগুলো উপহার দিলেন। সেদিন নবিজির স্থানে যদি আমরা হতাম, তা হলে অতীতের কথা ভেবে হয়তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। কত পরিশ্রমই-না করেছেন আমাদের নবি!

তথাপি মহান আল্লাহ বলেছেন, তোমার মিশন সমাপ্ত হয়েছে, এবার আল্লাহর স্মরণ করো।

'অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই ইবাদাতে রত হও।'[৩০০]

যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন কিতাব এবং মুজিযা দিয়ে। সৃষ্টি করেছেন জান্নাত, যার চারিদিকে শুধু বাগান আর বাগান। আরও আছে জাহান্নাম, যা চিরস্থায়ী আজাবের বাসস্থান। একজন মুসলিম অবশ্যই বিশ্বাস করে যে, এসব আল্লাহ তাআলা ক্রীড়াকৌতুক-রূপে করেননি। কেবল দুনিয়ার জন্য করেননি। আর যে মুসলিম এই বিশ্বাসে দৃঢ় সচেতন, তার পুরো জীবনটাই হয় আমলের সমারোহ। এক আমল থেকে আরেক আমলে ব্যস্ত থাকে সে। এমনকি সে যদি সাময়িক সময়ের জন্য বিনোদনে

[২৯৯] সূরা নাসর, ১১০ : ১-৩
[৩০০] সূরা আশ-শারহ, ৯৪ : ৭

ধাবিত হয়, তবুও সেটা হয় জান্নাতের পথ চলার আগ্রহ-উদ্দীপনা রিচার্জ করার জন্যেই। আল্লাহ্ বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'বলো, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মরণ বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।'[৩০১]

আসলে নেক আমল করার সুবর্ণ সুযোগ বছরের প্রতি মাসে, প্রতিদিনই থাকে। এই সুযোগ শুধু রমাদানে নয়, বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে নয়। বরং জীবনের প্রতিটি মিনিট আমলের সুবর্ণ সুযোগ। আর আল্লাহ আমাদের কাছে এটাই চান, যেন আমরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করি। এর জীবন্ত উদাহরণ আয়াতটিতে রয়েছে, 'অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনি ইবাদাতে রত হও।'[৩০২]

দেখুন, কীভাবে দ্বীন ইসলামকে আমাদের রব সাজিয়ে দিয়েছেন :

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য চারটি মাস নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যেগুলোকে বলা হয় 'হারাম তথা পবিত্র মাস'। অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে এই সম্মানিত মাসগুলোতে আমলের প্রতি অধিক উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। মাসগুলো ধারাবাহিকভাবে :

রজব মাস দিয়ে প্রথম হারাম মাস শুরু হয়। এরপর আসে অন্যান্য মাস। আসে শাবান মাস, এই মাসের অধিকাংশ দিন নবিজি সিয়াম পালন করতেন। এর পরে আসে বছরের শ্রেষ্ঠতম মাস 'শাহরু রমাদান'। এতেই রয়েছে বছরের শ্রেষ্ঠতম দশ রজনি, এবং বছরের শ্রেষ্ঠতম রাত 'লাইলাতুল-ক্বদর।'

রমাদন-পরবর্তী মাস শাওয়াল। এই মাসে ছয়টি সিয়াম পালন করতে বলা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি রমাদানের পর এই মাসে ছয়টি সিয়াম রাখে, তাকে সারা বছর সিয়াম রাখার প্রতিদান দেওয়া হয়। এভাবে শাওয়াল শেষে আসে যুল-ক্বদা। যুল-ক্বদা হলো দ্বিতীয় হারাম মাস। তা ছাড়া এটা হাজ্জের মাসগুলোর একটি।

যুল-ক্বদার পর যুল-হিজ্জা। এটি তৃতীয় হারাম মাস। এটাও হাজ্জের মাস। বছরের সেরা দশ দিন রয়েছে এই মাসের শুরুতে। এরপর বছরের শ্রেষ্ঠ দিন 'আরাফাহ'। এ দিনের সিয়াম পালন বর্তমান এবং পরবর্তী বছরের পাপসমূহ মুছে দেওয়া হয়। এ ছাড়া এই মাসে হাজ্জ সম্পন্ন হয়। আর যার হাজ্জ কবুল হয়, তার পাপসমূহ এমনভাবে মুছে দেওয়া হয়, যেন সে সদ্য-ভূমিষ্ট-নবজাতক!

---

[৩০১] সূরা আনআম, ৬ : ১৬২

[৩০২] সূরা আশ-শারহ, ৯৪ : ৭

এরপর আসে মুহাররম মাস। এটি চতুর্থ হারাম মাস। রমাদানের পর এই মাসে সিয়াম রাখার প্রতিদান সব থেকে বেশি। আশুরা মুহাররম মাসেই, যেদিন সিয়াম রাখলে এক বছরের পাপ মুছে দেওয়া হয়।

ভালোভাবে লক্ষ করুন, কীভাবে ইসলামি বর্ষপঞ্জি সাজানো হয়েছে। বছর শুরু হচ্ছে মুহাররম দিয়ে, যা অতি সম্মানিত ও ইবাদাতের মাস। আবার বছর শেষ হচ্ছে যুল-হিজ্জা দিয়ে, যা আরেকটি সম্মানিত ও ইবাদাতের মাস। খেয়াল করুন, অধিক সাওয়াব অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ কীভাবে বছরজুড়ে ছড়িয়ে আছে।

এমন বর্ষপঞ্জিই বলে দেয় আমাদের রব একজন, যিনি চান বান্দারা যেন এই আয়াতের ওপর আমল করে—'অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনি ইবাদাতে রত হও।' আমাদের রব চান, আমরা যেন তাঁকে নিয়েই কাটাই প্রতিক্ষণ, আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিই প্রতিটা মুহূর্ত।

এবার চলুন, প্রিয় নবি ﷺ-এর বরকতময় জীবনের দিকে মনোনিবেশ করি। এখন আমরা দেখব এই আয়াতের চশমায়, নবিজির জীবনটা কেমন ছিল। চলুন ঘুরে আসি ১৪০০ বছর আগে নববি যুগে।

মদীনায় হিজরতের প্রথম দশটি বছর যেভাবে কেটেছে নবিজির :

প্রথম হিজরি : রাবিউল আওয়াল মাসের ৮ তারিখে কুবায় পৌঁছান এবং তাৎক্ষণিক মাসজিদ আল-কুবা নির্মাণ করেন। এরপর সেই মাসেই তিনি মদীনার শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ১২ তারিখে পৌঁছান। সেখানে নির্মাণ করেন মাসজিদ আন-নববি, মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বাঁধনে বেঁধে দেন এবং ইয়াহূদিদের সাথে চুক্তি করেন।

দ্বিতীয় হিজরি : এই হিজরিতে সিয়াম, যাকাত, ঈদের সালাত, যাকাতুল ফিতরের বিধান জারি করা হয়। স্পষ্ট করে দেওয়া হয় জিহাদের বিধান এবং পরিবর্তন করা হয় কিবলা। এরপর সেই বছর সঙ্ঘটিত হয় ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ, রমাদানের ১৭ তারিখে। তারপর বানু কাইনুকার বিশ্বাসঘাতকতার দরুন তাদের উচ্ছেদ করা হয়।

তৃতীয় হিজরি : এই বছরের শাওয়াল মাসে উহূদ-যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। এ ছাড়া মদ হারাম হওয়া নিয়ে হামরা আল-আসাদ যুদ্ধও সঙ্ঘটিত হয়।

চতুর্থ হিজরি : আল-রাজী এবং বীরে মাঊনার মর্মান্তিক ঘটনাগুলো এই হিজরিতেই ঘটে। এরপর রাসূল ﷺ-কে গুপ্ত হত্যার চেষ্টার অপরাধে আন-নাদীর গোত্রকে উচ্ছেদ

করা হয়। হিজাবের আয়াত এই বছরেই নাযিল হয়েছিল।

পঞ্চম হিজরি : এই হিজরিতে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাফির এবং মুশরিকদের যৌথ প্রচেষ্টায় হাজার খানেক সৈন্য সে যুদ্ধে মদীনা ঘেরাও করে। এরপর ইয়াহূদিদের চূড়ান্ত উচ্ছেদের পালা আসে বানু কুরাইযার চুক্তিভঙ্গের কারণে। সবশেষে হাজ্জ ফরজ করা হয় এই বছর।

ষষ্ঠ হিজরি : মুসলিমরা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় সফর করে, কিন্তু পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হয় রিদওয়ান নামক স্থানে। এরপর ধীরে ধীরে রাসূল ﷺ বিশ্ব নেতাদেরকে ইসলামের আহ্বান জানিয়ে চিঠিপত্র পাঠাতে থাকেন।

সপ্তম হিজরি : এ বছর খায়বার যুদ্ধে ইয়াহূদিদের দুর্গ জয় করে মুসলিমরা এবং উমরাহ পালন করে।

অষ্টম হিজরি : মু'তার যুদ্ধ হয় এই বছর। মক্কা বিজয়ও হয় অষ্টম হিজরিতে। এ ছাড়া হুনাইন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারপর নবিজি সাহাবিদের নিয়ে তায়িফ অবরোধ করেন।

নবম হিজরি : তাবূক যুদ্ধ এই বছরেই হয়। যুদ্ধ শেষে রাসূল ﷺ-এর সাথে সন্ধি-চুক্তির উদ্দেশ্যে দিগ্বিদিগন্ত থেকে ৭০ এর অধিক প্রতিনিধি মদীনায় আসে।

দশম হিজরি : বিদায় হাজ্জ আয়োজিত হয় দশম হিজরিতে। এরপর রাসূল ﷺ উসামা ইবনু যাইদ ﷺ-কে সেনাপ্রধান নিয়োগ দিয়ে একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন।

একাদশ হিজরি : একাদশ হিজরি সনের মাথায় সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। রাসূল ﷺ-এর নিরলস পরিশ্রমের ফলাফলের এক ঝলক ছিল এটি। কিন্তু শরীরের-ওপর-দিয়ে-যাওয়া প্রচণ্ড ধকল ও জখমের ফলে এ বছর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে পারছিলেন না। সবশেষে এ বছর মুসলিম উম্মাহর ওপর সবচেয়ে বড়ো বিপদ নেমে আসে। রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ, সোমবার বাদ ফজর, দুহা সালাতের সময় আমাদের রাসূল ﷺ রবের ডাকে সারা দিয়ে পরলোক গমন করেন। জাতি হারায় তার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে...

আসলে নবিজির গোটা জীবনই ছিল এই আয়াতের তাফসীর :

> 'অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই ইবাদাতে সচেষ্ট হও।'[৩০৩]

আমাদের কাছে আল্লাহ এটাই চান। রাসূল ﷺ-এর রেখে-যাওয়া-সুন্নাহ যেদিন আমরা আমাদের পরিবারে, আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব, সেদিন থেকেই উম্মাহর আমূল পরিবর্তন শুরু হবে।

---

[৩০৩] সূরা আশ-শারহ, ৯৪ : ৭

দীঘল দিনের আলো নিভে আসে আঁধার-কালো-রাত, এভাবেই ফুরিয়ে যায় আমাদের জীবন-নামক ডায়রির পাতাগুলো। এমন দিন খুব দূরে নয়, যেদিন আর কোনো পাতাই মিলবে না এই ডায়রিতে...

কাজেই দিনশেষে যখন আপনি হেলিয়ে দিচ্ছেন নিজেকে আরাম বিছানায়, প্রশ্ন করুন : ওপারের জীবনের জন্য কী করলাম? আজকের দিনটি কি আমি আল্লাহর বান্দার মতো কাটিয়েছিলাম? সময়ের সদ্ব্যবহার করেছি কতটুকু? হাশরের ময়দানে আজকের এই দিনটি কি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে না বিপক্ষে?

পরিশেষে আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত : এরকম একটি ব্যস্তজীবনের কথাই যদি কুরআন বলে থাকে—দুআ, সালাত, সক্রিয়তা, আত্মোন্নয়ন, পরিকল্পনা অনুযায়ী চলা, আখিরাত গড়া—তা হলে এসবের সমাপ্তি কবে? অবসর কবে মিলবে?

একবার ইমাম আহমাদ ﷺ-কে ঠিক এই প্রশ্নটিই করা হয়েছিল :

متى يجد المؤمن طعم الراحة؟

'মুমিনের জীবনে অবসর কবে মিলবে?'

উত্তরে তিনি বললেন,

إذا وضع رجله في الجنة

'জান্নাতে পা রাখার সাথে সাথেই।'[৩০৪]

হ্যাঁ, সেদিনই সকল কষ্টের বোঝা লাঘব হবে। দূর হবে ক্লান্তি আর অবসাদ। মুছে যাবে উদ্‌বেগ-দুশ্চিন্তার প্রতিটি ফোঁটা। চিরদিনের জন্য জীবন থেকে বিদায় নেবে এগুলো। সেদিন মানুষ শুধু শুনবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের থেকে হটিয়ে দিয়েছেন সকল দুঃখ-কষ্ট"[৩০৫]

ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার জীবনের প্রতিটি দিন ঢেলে সাজান এই আয়াতের আলোকে :

'অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনি ইবাদাতে সচেষ্ট হও।'[৩০৬]

---

[৩০৪] তারিখু মাদীনাতি দিমাশক, ৬/১৩
[৩০৫] সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৪
[৩০৬] সূরা আশ-শারহ, ৯৪ : ৭

মৃত্যুর দোরগোড়ায়

গত রাতে তারাবি সালাত চলাকালে পঞ্চাশোর্ধ্ব এক মুসল্লি পড়ে যায়। তখন মাত্র পাঁচ কী ছয় রাকআত শেষ হয়েছে। তাৎক্ষণিক ঘোষণা করা হয়, জামাতে যদি কোনো ডাক্তার উপস্থিত থাকে সে যেন চলে আসে এবং তাকে চেকআপ করে। সে জ্ঞান হারায়নি এবং তাকে সুস্থই মনে হচ্ছিল। ডাক্তার তাকে নিয়ে গেলে আবার জামাত দাঁড়িয়ে যায়। পরবর্তীকালে নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কতই-না উত্তম মৃত্যু! সম্ভবত আল্লাহর কাছে তার দাঁড়ানো এতই প্রিয় ছিল যে, তিনি বান্দাকে ইবাদাতের সময়ে নিয়ে গেলেন!

রাসূল ﷺ বলেন,

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ

'আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তাকে দিয়ে তিনি আমল করান।'

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী রকম ইয়া রাসূলুল্লাহ?'

তিনি বলেন,

يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ

'মৃত্যুর পূর্বে তাকে নেক আমলের তাওফীক দেন।'[৩০৭]

সত্যি বলতে রমাদানের শুরুতে চরম আগ্রহ থাকা, তারপর সেই আগ্রহে ভাটা পড়া—এটাই প্রমাণ করে, শেষ ভালো যার সব ভালো তার।

[৩০৭] তিরমিযি, ২২৯২

ওপারের ডাক কোন মুহূর্তে আসবে—এই চিন্তা বহু দ্বীনদার বান্দার চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। অজস্র অশ্রু ঝরায় তাদের এই ভাবনা :

'অন্তিম মুহূর্তে আমি কোন অবস্থায় থাকব?'

'মৃত্যুর ফেরেস্তাকে দেখার ভয় আমাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেবে না তো?'

'আমার পাপের বোঝা যদি সেদিন শাহাদাত পাঠে বাধা হয়ে দাঁড়ায়?'

'আমি কি মুসলিম অবস্থায় মরতে পারব?'

প্রথম তিন প্রজন্মের বিখ্যাত আলিম সুফইয়ান সাওরি ﷬। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়, অঝোরে কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করা হলো, এই ক্রন্দন কি তার পাপের জন্য? তিনি মাটি থেকে একটি লাঠি ওপরের দিকে তুললেন এবং বললেন,

لذنوبي عندي أهون من ذا - ورفع شيئاً من الأرض - ولكني أخاف أن أسلب الإيمانَ قبل أن أموت.

'বিশাল জমিন হতে এই লাঠি সরিয়ে নেওয়া জমিনের জন্য যতটা মামুলি বিষয়, আমার কাছে আমার পাপ এর চেয়েও তুচ্ছ (অর্থাৎ পরিমাণে অনেক কম)। বরং আমার ভয় হচ্ছে, মৃত্যুর সময় যদি আমার ঈমান তুলে নেওয়া হয়!'[৩০৮]

ইমাম শাফিয়ি ﷬-এর সাথেও অনুরূপ ঘটেছিল। তিনি যখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন, তাঁর এক ছাত্র আল-মুযানি ঘরে প্রবেশ করে জানতে চায়, 'ইমাম, আপনি কেমন আছেন?' তিনি বলেন,

أصبحت من الدنيا راحلاً، وللإخوان مفارقاً، ولربي ملاقياً، ولا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها

'বুঝতে পারছি যাত্রার অবসান ঘটতে যাচ্ছে, ভাইদের বিদায় দেবার সময় ঘনিয়ে এসেছে, এবং সময় চলে এসেছে রবের সাথে সাক্ষাতের। অথচ আমি জানি না, আমার রূহ কি জান্নাতে প্রবেশের দ্বারা আমার সম্মান বৃদ্ধি করবে, না জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে আফসোসের মধ্যে ফেলে দেবে!'[৩০৯]

এমনকি রাসূল ﷺ-এর সাহাবি মুয়াজ ইবনু জাবাল ﷛-এর জীবনেও অনেকটা এরকম ঘটনা ঘটেছিল। তিনি তখন মৃত্যুর বিছানায়, উপস্থিত লোকেরা তাঁকে বলতে শুনল,

[৩০৮] সিয়ার, ১৩/২৯৭

[৩০৯] বায়হাকি, যুহদুল কাবীর, ৫৭৫

انظروا هل أصبح الصباح؟

'বাহিরে দেখে আসো তো, এখনও সকাল হয়েছে কি না?'

তারা বলল, রাত এখনও বাকি আছে। তিনি কিছুক্ষণ পর আবার একই প্রশ্ন করলেন। তারা তাঁকে আশ্বাস দিল সূর্য এখনও ওঠেনি। তৃতীয়বারের মতো যখন প্রশ্নটা করতে যাবেন এবার তিনি চিৎকার করে বললেন,

أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار

> 'আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই এমন রাত থেকে, যার সকাল হবে জাহান্নামে।'[৩১০]

জাহান্নামের ভয়ে সদা তটস্থ থাকতেন মুয়াজ। তাই আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইছিলেন। এই রাতেই যদি তার মৃত্যু হয়, তবে সকালবেলায় যেন তার রূহ জাহান্নামে না চলে যায়। তাই তিনি এই দুআ করছিলেন।

দেখে মনে হচ্ছে যেন এই কথাগুলো এমন কেউ বলছেন, যাদের জীবনটা ছিল পাপে টইটম্বুর, বিভিন্ন প্রকার নেশায় এবং খেলতামাশায় কেটেছে। বাস্তবে এমন কিছুই না। এই মানুষগুলোর পুরো জীবনটাই ছিল ইবাদাত, শিক্ষাপ্রদান এবং তাওবার সমষ্টি। তবুও তারা উপলব্ধি করতে পারতেন, মৃত্যু এমন এক পরীক্ষার সময়, যখন জীবনের সকল আমল ভেস্তে যেতে পারে।

এমন ব্যক্তির ব্যাপারে কী বলবেন, যে ব্যক্তি দিনভর সিয়াম রাখল, তারপর সূর্য ডোবার আগ মুহূর্তে খুব অল্প পরিমাণ খেয়ে নিল? নিশ্চয়ই বলবেন, তার সিয়াম নষ্ট হয়ে গেছে!

আচ্ছা, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে কী মনে হয়, যিনি ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা সালাতে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু সালাম ফেরার আগে হঠাৎ মনে হলো তিনি ওযু অবস্থায় নেই?

তার সালাত নষ্ট হয়ে গেছে।

তদ্রূপ কেউ হয়তো বাহ্যিক ধার্মিকতায় এবং ইবাদাত পাবন্দির এক লম্বা জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু দেখা গেল সব বিগড়ে গেছে অন্তিম মুহূর্তে এসে। তার সব আমল ধূলিকণায় পরিণত হয়েছে। কিংবা সে শেষ মুহূর্তে এসে আমল ছেড়ে দিল।

আসলে এ ব্যাপারে আমরা কেউই নিশ্চয়তা দিতে পারি না, আমাদের মৃত্যু কেমন হবে। হ্যাঁ, কিছু ইঙ্গিত তো অবশ্যই রয়েছে।

---

[৩১০] আহমাদ, আয-যুহদ, ১০১১

ইমাম ইবনু কাসীর ﷺ বলেন,

حَافِظُوا عَلَى الْإِسْلَام فِي حَال صِحَّتِكُمْ وَسَلَامَتِكُمْ لِتَمُوتُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ الْكَرِيم قَدْ أَجْرَى عَادَتَهُ بِكَرْمِهِ أَنَّهُ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْء مَاتَ عَلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْء بُعِثَ عَلَيْهِ فَعِيَاذًا بِاَللَّهِ مِنْ خِلَاف ذَلِكَ

'সুস্থতা এবং নিরাপদ থাকাকালে ইসলাম পালনে সচেষ্ট হও, যেন তুমি এর ওপরেই মৃত্যুবরণ করতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহ আল-কারীম, অত্যন্ত উদার। তিনি তাঁর অসীম উদারতা প্রদর্শনের ধারা চলমান রেখেছেন এবং তিনিই নির্ধারণ করেছেন, যে ব্যক্তি যেভাবে জীবন অতিবাহিত করবে, তার মৃত্যুও হবে সেভাবে। আর যে ব্যক্তি যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে উত্থিতও ওই অবস্থায়।'[৩১১]

রমাদানের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করছি আমরা। এই বিদায়-বেলাই বলে দেবে সত্যিকারার্থে কে আল্লাহর দৃষ্টিতে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিল। প্রতিজ্ঞা করুন, অটল থাকবেন শেষ পর্যন্ত।

অটল থাকবেন রমাদানের শেষেও, থাকবেন জীবনকে বিদায় জানাবার দিনেও।

[৩১১] ইবনু কাসীর, ২/৭৫

প্রকৃত স্বস্তি তাঁরই সান্নিধ্যে

প্রকৃত স্বস্তি আর প্রশান্তি শুধু এক সত্তার সান্নিধ্যের মধ্যেই।

এই অন্তর কখনোই ক্লান্ত হয় না তাঁর অবিরাম স্মরণে ও বিরতিহীন প্রশংসায়।

বরং আত্মা-মনন সব একাগ্র হয়ে যায় তাঁকে পাবার আকাঙ্ক্ষায়।

তাঁকে ডেকে চলার মধ্যে হৃদয়ে যে উষ্ণতা মেলে, এর কোনো তুলনা নেই।

তাঁর রহমতের ভিখারির চোখ বেয়ে যে অশ্রু ঝরে পড়ে, এর নেই কোনো উপমা।

তাঁর দরজায় অনবরত কড়া নাড়ার মাধ্যমে যে প্রশান্তি লাভ হয়, রাজা বাদশাহরা তা কল্পনাও করতে পারবে না।

তিনিই মাবূদ, সীমাহীন দয়াবান। তিনি অপরাজেয়, অসীম রাজত্বের অধিকারী, অসীম দানশীল।

তিনিই মাবূদ, আর তাই দাসেরা তাঁকে মেনে চলে পরমানন্দে।

তিনিই মাবূদ, তাঁর সাহায্য ছাড়া কোনোকিছুই করা যায় না।

তিনি ব্যতীত সমগ্র সৃষ্টিকুলের কোনো পরিচয় নেই।

প্রাণের স্পন্দন থেমে যাবে যদি তিনি একমুহূর্তের জন্যও আড়াল হয়ে যান।

বস্তুত তাঁকে ছাড়া একমুহূর্তও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

আমরা মানুষদের ভালোবাসি তাদের কাজের জন্য, যে গুণগুলো তারা অর্জন করেছে সেসবের জন্য। তথাপি কেবল সত্তাগত কারণে চূড়ান্ত ভালোবাসার অধিকার রাখে বাস্তবে এমন কেউ নেই; এমনকি নবি রসূলগণও নন। এই নিয়মের ব্যতিক্রম কেবল একজনই। আর তিনি হলেন আমাদের রব, আল্লাহ তাআলা।

ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার, কেন রসূল ﷺ বলেছিলেন, কবিদের ভিতর সর্বাধিক সত্য কথা কবি লাবীদের কথা। যিনি বলেছেন,

أَلا كُلُّ شَيْءٍ ما خَلا اللهَ باطِلُ

'জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই মিথ্যে।'[৩১২]

এমন গুণসম্পন্ন রবকে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, সে তো অন্যদের মতো নয়।

তাই তোমার দিন-রাতের ঘণ্টাগুলো অন্যদের মতো হতে পারে না।

তোমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য মুহূর্তগুলো অন্যদের মতো হতে পারে না।

অতএব লুটিয়ে পড়ো তাঁর সাজদায়। আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ক্রন্দনে ভাসিয়ে দাও জমিন। সত্যনিষ্ঠ একজন মুসলিমের ছাঁচে নিজেকে গড়ে তোলো এবং প্রকৃত সুখের সন্ধানে লেগে যাও নতুন উদ্যমে।

---

[৩১২] বুখারি : ৬১৪৭; মুসলিম : ২২৫৬

মহিউদ্দিন রূপম। জন্ম ৯ই যিল-হাজ্জ ১৪১৫ হিজরিতে। বেড়ে উঠেছেন পুরান ঢাকার গেণ্ডারিয়ায়। এসএসসি বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে, এবং ঢাকা সিটি কলেজ থেকে এইচএসসি। তারপর সরকারি কবি নজরুল কলেজ থেকে বিবিএ অনার্স সমাপ্ত করেন ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিখ্যাত ইসলামি অনলাইন শপ Wafilife-এর কন্টেন্ট ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, পাশাপাশি ওয়াফি পাবলিকেশনে সম্পাদক হিসেবে আছেন। ভালোবাসেন ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করতে এবং অর্জিত জ্ঞানটুকু সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। তার অনূদিত প্রথম বই 'নূরুন আলা নূর : আল-কুরআনের শৈল্পিক উপমা' ইবনু কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ রচিত।

প্রত্যেকের কান্না তিনি শোনেন। শোনেন অশ্রুহীন নীরব কান্নার ধ্বনি। এমন ব্যক্তির কান্নাও শোনেন, যার আওয়াজ তোমার কানে পৌঁছোয় না। পৃথিবীর বুকে টপকে-পড়া প্রতিটি অশ্রুবিন্দু তিনি দেখেন। তিনি জানেন, তুমি কতটা কষ্টে আছ। তোমার দেহ-মনকে অস্থির করে রাখা যন্ত্রণা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। তুমি যেখানেই একা হও না কেন, সেখানেই তিনি আগলে রাখেন পরম যতনে। কারণ, তিনিই তোমার রব। তোমার আল্লাহ। আর তাই তোমায় একা ছেড়ে দেন না এক মুহূর্তের জন্যও।

"যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।"

[সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৪]

বিশুদ্ধ একটি মন নিয়ে তাঁর দুয়ারে ফিরে যাবার সময় তো এখনই। এখনই সময় তাঁর সমীপে নিজেকে বিলিয়ে দেবার। জীবনের সকল কষ্ট, সকল হতাশা ছুড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াও। নির্মল অন্তর নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ানোর সময় এসে গেছে তোমার। এসো, আজ থেকেই শুরু করি একটি কলুষতা-মুক্ত অন্তর গড়ার যাত্রা। নির্মল জীবন গড়ার যাত্রা। আর রবের সাথে মিলিত হই কলবুন সালীম নিয়ে...